মহাবিশ্বে মানুষ
পুস্তকমালা

মহাবিশ্বের বয়স ও আমাদের মহাজাগতিক শিকড়

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

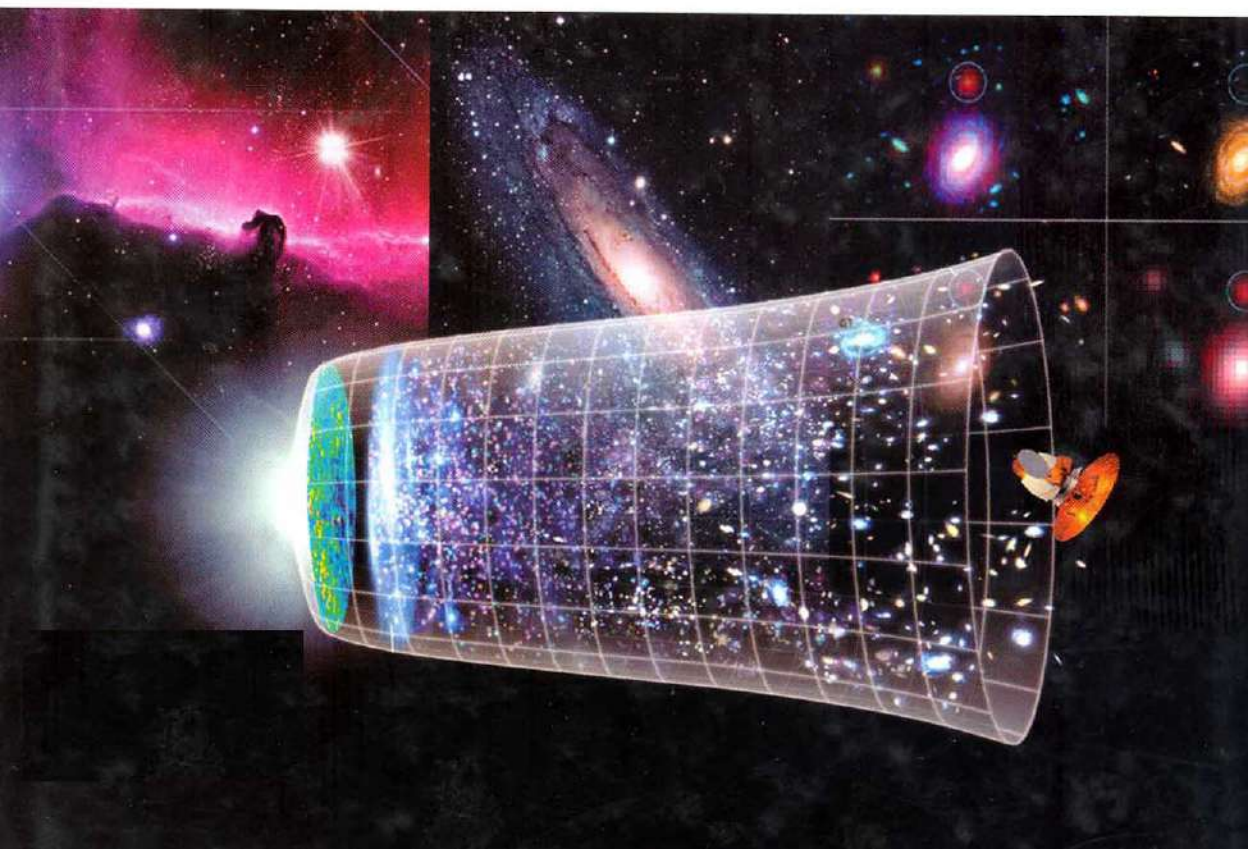

মহাবিশ্বে মানুষ
পুস্তকমালা

মহাবিশ্বের বয়স ও আমাদের মহাজাগতিক শিকড়

মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি যে অনেক বড় তা হাজার বছর ধরে মহাকাশের দিকে তাকিয়েই আমরা জানি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক গভীরভাবে জানতে ও বুঝতে পেরেছি শক্তিশালী পর্যবেক্ষেণের সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অদ্ভুত সম্মিলনের ফলে। এভাবে জেনেছি মহাবিশ্ব অকল্পনীয় ভাবে বিশাল, কিন্তু সসীম। আজ থেকে চৌদ্দ শত কোটি বছর আগে একেবারেই চরম পরিস্থিতির একটি বিন্দুবৎ অবস্থা থেকে বিস্ফোরণের মত একটি ঘটনায় তার জন্ম হয়েছিল, সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল স্থানের ও কালের। জন্মের মুহূর্ত থেকে মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। আজ তার ব্যাপ্তির যদ্দূর পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই তার থেকেও আলো আমাদের কাছে আসতে এক হাজার কোটি বছর লেগে যায়।

মহাবিশ্বের এ ইতিহাস অনেক চমকপ্রদ ঘটনায় ভর্তি। বিশেষ করে তার সৃষ্টির মুহূর্তগুলোর সাম্প্রতিক তত্ত্ব আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে একেবারে হকচকিয়ে দেয়। এখন আরো জানছি যে আমাদের দেহ-বস্তুগুলো পর্যন্ত ঐ ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের শিকড় সেখানেই। ওখানকার ঘটনাগুলোর অতিসূক্ষ্মতার মধ্যে একটু এদিক ওদিক হলেই আমরা আসতামনা। এই বইয়ে আমরা দেখবো কীভাবে মহাকাশ পর্যবেক্ষণকারীরা, অতি শক্তিশালী কণিকা-ত্বরক নিয়ে পরীক্ষণরত বিজ্ঞানীরা, আর তাত্ত্বিক পদার্থবিদরা একযোগে কাজ করে এই সব উদ্ঘাটন করেছেন, এখনো করে চলেছেন। মহাবিশ্বের অতি ক্ষুদ্র অংশ হয়েও এর সৃষ্টি রহস্য ও ইতিহাসকে উন্মোচন করে, এবং তা কিছুটা অনুধাবন করে, আমরাও নিজেদেরকে বিশালের সঙ্গে যুক্ত করতে পারছি।

প্রচ্ছদ ॥ মোবারক হোসেন লিটন

পুস্তকমালা

মহাবিশ্বে মানুষ

প্রথম বই

মহাবিশ্বের বয়স ও আমাদের মহাজাগতিক শিকড়

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

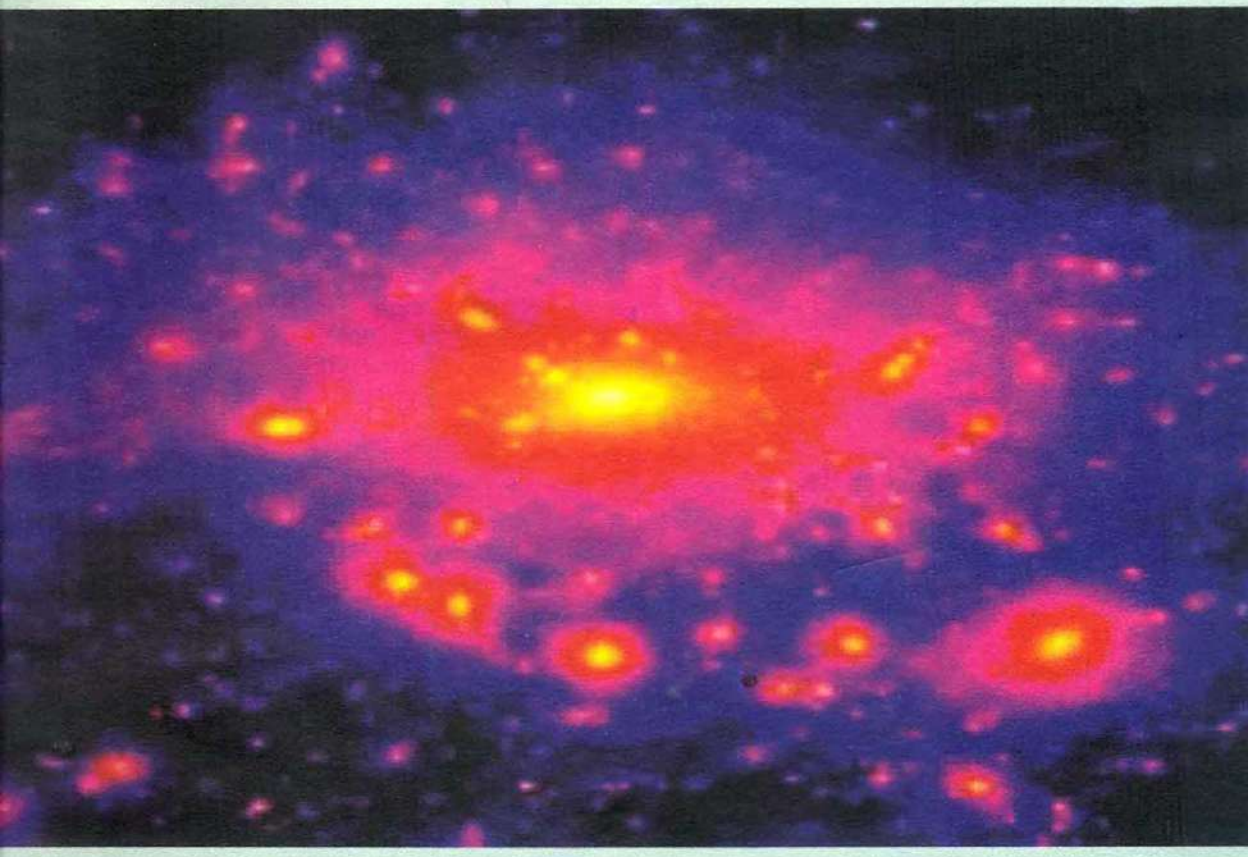

মহাবিশ্বে মানুষ । প্রথম বই

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১ ।
প্রকাশক : আহমেদ মাহ্‌ফুজুল হক ।
সুবর্ণ । বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (দোতলা) রুম নং ২৩৫ ।
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১২২৪১৬ ।
পৃষ্ঠা বিন্যাস : পারফর্ম কম্পিউটার্স, ১০৫ ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০
মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স । ৩৬ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন । স্বত্ব : লেখক ।

মূল্য । ৩০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984 70297 0054-9

উৎসর্গ

যাদের সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনা করে সব সময়
অসীম আনন্দ লাভ করেছি,
যাদের অনুসন্ধিৎসু মন ও স্বপ্নভরা চোখ
সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে,
যুগে যুগে যারা মহাবিশ্বে মানুষের স্থানটিকে
উজ্জ্বলতর করে তোলার প্রয়াস নিয়েছে, সেই–
তরুণ-তরুণীদেরকে

পুস্তকমালার ভূমিকা

প্রাণিজগতে আমাদের যে প্রজাতি তার বৈজ্ঞানিক নাম নিজেরা দিয়েছি হোমো সেপিয়েন্স অর্থাৎ 'জ্ঞানী মানুষ'। অন্য সব প্রজাতিকে ছাড়িয়ে যে অনন্যতা আমরা লাভ করেছি তার বড় প্রকাশ উচ্চতর চিন্তার ক্ষমতা, এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করার আগ্রহ ও সক্ষমতা। নিজেদের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আত্মঅনুসন্ধানও এই উদ্ঘাটন চেষ্টার অন্তর্ভূক্ত। আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, কেমন করে চিন্তা করি, অন্য সবকিছুর সঙ্গে আমাদের কী রকম সম্পর্ক, ভবিষ্যতে কী সংকট ও কী সম্ভাবনাগুলো আসতে পারে – বিজ্ঞান এ সব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং এখন উত্তরগুলোকে সূক্ষ্মভাবে প্রমাণিত করতে পারছে। সামনে যে তা আরো শাণিত হবে তাও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। 'মহাবিশ্বের মানুষ' এই পুস্তকমালা এসবকেই সবার জন্য সহজভাবে পরিবেশন করার প্রয়াস নিয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে লেখক এ বিষয়গুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কিছু বিজ্ঞান-বক্তৃতা দিয়েছেন সর্ব-সাধারণের জন্য। 'সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান' নামের এই বক্তৃতাগুলো প্রতি মাসে ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং চ্যানেল আই কর্তৃক টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছে। পুস্তকমালার বইগুলো তার ভিত্তিতেই রচিত। বক্তৃতার সময় তোলা শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তরগুলো এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একেবারেই সাম্প্রতিক বিজ্ঞান এসব নিয়ে আমাদের জ্ঞানের সীমান্তটি যেখানে এনে দিয়েছে, সকল জটিলতা সত্ত্বেও তাকেই সহজ ভাষায় উপভোগ্য করার চেষ্টা এতে রয়েছে। মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশকে বুঝার ও তাতে আত্মঅনুসন্ধানের কিছু স্বাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ও ধরিত্রীর ভবিষ্যতের স্বার্থে আমাদের জীবনভঙ্গির অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও এর মধ্যে অনিবার্যভাবে এসেছে। সব মিলে পুস্তকমালাটি আগ্রহী সবার জন্য, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের জন্য, চিন্তার ও আনন্দের খোরাক যোগাবে বলেই বিশ্বাস।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

পুস্তকমালার অন্যান্য বই

চারশত কোটি বছরের পৃথিবী ও প্রাণ

আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা

আমরা কী ভাবে চিন্তা করি

জীববৈচিত্র ও আমাদের ভবিষ্যৎ

উদ্ঘাটিত ডিএনএ, উৎসারিত সম্ভাবনা

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন

নূতন আবাস, নূতন পড়শীর খোঁজে

এখনো মহাকাশ পর্যবেক্ষণকারীরা, অতি শক্তিশালী কণিকা ত্বরকের সাহায্যে প্রকৃতির মৌলিক কণিকাগুলোর পরীক্ষণ কাজে রত পদার্থবিদরা, এবং তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা একযোগে এই কাহিনীকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অকল্পনীয়ভাবে বিশাল ও জটিল এই মহাবিশ্বের রহস্য জাল উন্মোচন করে চলেছি আমরা মানুষ– এরই অতি ক্ষুদ্র অংশ হয়েও। আমরা যখন সীমিত পরিসরে নিজের সীমিত জীবনকালকে ছাড়িয়ে গিয়ে আমাদের চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসাকে মহাবিশ্বের বিশাল ব্যাপ্তিতে নিয়ে যাই, তখন নিজেদেরকেই আমরা সেই বিশালতার অংশ হিসাবে অনুভব করার সুযোগ পাই।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

দুটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়

বিগ্ ব্যাং ও আমাদের শিকড়

বয়সের প্রশ্নটি কেন?

এই বইতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও বিকাশের সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় দুটি বিষয় অনিবার্যভাবে চলে আসবে। একটি হলো মহাবিশ্বের সুনির্দিষ্ট বয়স রয়েছে, এবং আজ অবধি তার ইতিহাস উদ্ঘাটন থেকে সেই বয়স নির্ণয় করা। আর একটি হলো মহাবিশ্বের বিস্তৃত স্থান-কালের মধ্যে এবং এর ইতিহাসের নানা ঘটনার মধ্যে আমাদের নিজেদের মহাজাগতিক শিকড় দেখতে পাওয়া।

মহাবিশ্বের বয়সের প্রশ্নটি উঠার মানেই হলো ধরে নেয়া যে এর একটি শুরুর মুহূর্ত আছে যেখান থেকে বয়স গণনা করা যায়। মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমনি একটি তত্ত্ব আমরা এখন মেনে নিয়েছি। সকল সাক্ষ্য প্রমাণ এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ তত্ত্ব মূলত বলছে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল শূন্যাবস্থা থেকে সৃষ্টি হওয়া একটি অতিঘন বিন্দু থেকে হঠাৎ বিস্ফোরণের মত প্রক্রিয়ায় তার প্রসারণ শুরুর মাধ্যমে। চলতি কথায় এর নামই বিগ ব্যাং মানে বড় আওয়াজ। এটিই স্থানের শুরু, এটিই কালেরও শুরু। এর আগে কাল বলে কিছু নাই, এর বাইরে স্থান বলে কিছু নাই। এই সৃষ্টির পরই কাল শুরু হয়েছে, ঐ প্রসারণের মাধ্যমেই স্থান প্রসারিত হয়েছে বিন্দু থেকে। কাজেই বস্তু বলে যখন কিছু ছিলনা কোন রকম আওয়াজ সৃষ্টির সুযোগ সেখানে ছিলনা; সেই অর্থে বিস্ফোরণেরও নয়, কারণ বিস্ফোরিত হয়ে তা যাবে কোথায়? সে তো নিজেই বিশ্ব, তার বাইরে তো কিছু নাই। বিগ্ ব্যাং কথাটি তাই যথার্থ নয়। তবুও আমরা চালু হয়ে যাওয়া ঐ শব্দটি দিয়ে সৃষ্টির মুহূর্তের ঐ ঘটনাটিকে বুঝাব। স্থান ও কালের একটি শুরুর বিন্দু আছে এমন কথা সাধারণ বুদ্ধিতে মেনে নেয়া কঠিন। কিন্তু বিজ্ঞান সেটি প্রমাণ করেছে। এ সম্পর্কে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিজাত কিছু অনিবার্য প্রশ্ন এবং সেগুলোর অপেক্ষাকৃত জটিল কিছু সম্ভাব্য উত্তর আমরা বইয়ের শেষের দিকে দেবার চেষ্টা করব। আপাতত আমরা এ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত হবার পেছনে সরলতর যুক্তিগুলো অনুসরণ করব।

বিগ্ ব্যাং তত্ত্বটি বহুদিন ধরে প্রচলিত থাকলেও একই সঙ্গে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বও বেশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল– স্থিতি অবস্থার তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের কোন শুরুর মুহূর্ত নাই বিশ্ব চিরকাল মোটের উপর একই রকম রয়ে গেছে, যদিও স্থানীয়ভাবে সৃষ্টি,

বিলয়, পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটে চলেছে। কাজেই বয়সের প্রশ্ন তার ওঠেনা। দুটি তত্ত্বেরই সপক্ষে কিছু কিছু যুক্তি ছিল। যদিও বিগ্ ব্যাং তত্ত্বের প্রমাণের পাল্লাটি একটু ভারী ছিল, তবুও বিতর্ক কিন্তু থেকেই যাচ্ছিল। তারপর ১৯৬৫ সনে ঘটনাচক্রে একটি আবিষ্কার সব কিছু চূড়ান্ত করে দিল। বিগ্ ব্যাং তত্ত্ব নিশ্ছিদ্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। মহাবিশ্বের বয়সের বিষয়টিও স্থির হয়ে গেল। আমরা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে মহাবিশ্ব এখন থেকে চৌদ্দ শত কোটি বছর আগের সৃষ্টি। কেমন করে ঠিক এই বয়সের সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম সেটি আমরা দেখবো কিছুটা পর।

বিগ্ ব্যাং এর প্রাচীন বিকিরণে ডুবে আছি

১৯৬৫ সালের কথা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে বেল ল্যাবোরেটরির দুজন বিজ্ঞানী উইলসন ও পেনজিয়া সে সময়ের একটি নিয়মিত গবেষণার কাজ করছিলেন রেডিও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে। বেশ কিছু বছর ধরে জানা ছিল যে আকাশের কোন কোন তারা বিশেষ রেডিও তরঙ্গ বিকীর্ণ করে, পৃথিবী থেকে এন্টেনার সাহায্যে সেই তরঙ্গ উদ্ঘাটন করে সেসব তারা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। ঐ দুই বিজ্ঞানী আমাদের ছায়াপথের এরকম রেডিও তারাগুলোর জরিপ কাজ করছিলেন। এর জন্য তাঁরা বহু রকম কাজে ব্যবহৃত সাধারণ হর্ণ এন্টেনা (অনেকটা খোলা জায়গায় ব্যবহৃত লাউডস্পীকারের চোঙ্গার মত) ব্যবহার করছিলেন। এরকম পরীক্ষায় রেডিও তরঙ্গকে সচরাচর শব্দে পরিণত করে শোনার চেষ্টা করা হয়। তাঁরা দেখলেন এক রকম হিস্‌স্ শব্দ ঠিকই আসছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ তারার দিকে এন্টেনা তাক করলে এ শব্দ যেভাবে আসার কথা সেভাবে নয়। উপরে, ডানে, বামে যে কোন দিকে এন্টেনাটি তাক করা হোক না কেন শব্দটি প্রায় সমান ভাবে আসছে কোন দিকে কোন তারতম্য হচ্ছেনা। কোন তারা থেকে এটি আসলে এমন হবার কথা নয়। স্বাভাবিক ভাবে তাঁরা একে তাঁদের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিরই একটি 'নয়েজ' (স্বাভাবিক আচরণের বিচ্যুতি) বলেই ধরে নিলেন, এবং এ নয়েজ দূর করে আসল রেডিও তারার সন্ধানের সুযোগ পাওয়ার জন্য যন্ত্রপাতিতে বার বার খোলা বাঁধা করলেন, পরিবর্তন আনলেন। এমনকি হর্ন এন্টেনায় ঢোকা পায়রার যে বিষ্ঠা লেগে রয়েছে তাও ঘষে পরিস্কার করতে ভুললেননা। কিন্তু ফলাফলে কোন পরিবর্তন ঘটলোনা, সেই শব্দ সবদিক থেকে আসতেই থাকলো। এ যেন মহাবিশ্বের বিশেষ বিশেষ অংশ থেকে আসা সব সিগন্যালের পটভূমি তৈরি করা একটি সর্বব্যাপ্ত উপস্থিতি। তখন অন্যান্য কিছু বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের মনে পড়লো

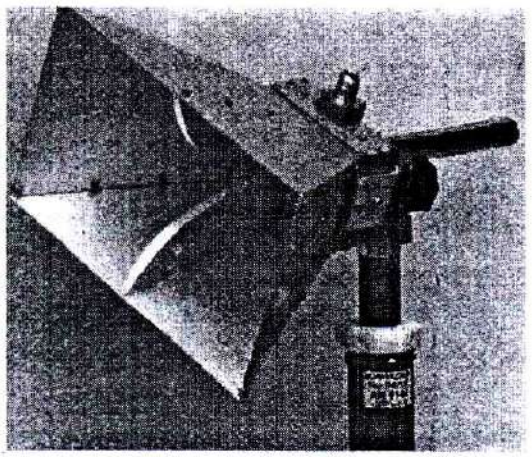

হর্ণ এন্টেনা- যে রকম মামুলি ব্যবস্থায় কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড ধরা পড়েছিল

বিগ্ ব্যাং তত্ত্ব ভিত্তিক একটি ধারণার কথা।

বিগ্ ব্যাং এর পর বিন্দু থেকে শুরু করে মহাবিশ্ব যখন প্রসারিত হয়েছে তখন এক পর্যায়ে তার মধ্যে শক্তি অংশটুকু বস্তু অংশ থেকে স্বাধীন হয়ে বিশ্বকে পরিব্যক্ত করে রেখেছে। ঐ শক্তি প্রকাশিত হয়েছে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ রূপে বিগ্ ব্যাং এর পর পর সময়ে যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ ছিল ক্ষুদ্র। যেসময় বিশ্ব যতটুকু ছিল তার পুরোটাকে ভর্তি করে রেখেছিল এটি। বিশ্ব ক্রমে প্রসারিত হয়ে যতই বড় হয়েছে ঐ বিকিরণও প্রসারিত হয়েছে, ফলে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ ক্রমে বড় হয়েছে। তাই প্রথম পর্যায়ে দৃশ্য আলো হিসাবে এটি থাকলেও হিসাব মতো এখন এটি থাকার কথা সুনির্দিষ্ট বৃহত্তর তরঙ্গ-দৈর্ঘের মাইক্রোওয়েভ হিসাবে। একই সঙ্গে অতি উত্তপ্ত অবস্থা থেকে বিকিরণের উত্তাপও ক্রমাগত ঠান্ডা হতে হতে এখন এর উত্তাপ হবার কথা ৩ ডিগ্রি কেলভিন অর্থাৎ গলন্ত বরফের উত্তাপের চেয়ে ২৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে। মনে রাখতে হবে কেলভিন স্কেলে শূন্য ডিগ্রি হলো সেলসিয়াস স্কেলের শূন্য ডিগ্রির চেয়ে ২৭৩ ডিগ্রি নিচে। এই শূন্য ডিগ্রি উত্তাপটিই তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব নিম্নতম উত্তাপ–পরম শূন্য। এক ডিগ্রি উত্তাপের তারতম্য অবশ্য কেলভিন ও সেলসিয়াস উভয় স্কেলে একই।

উইলসন ও পেনজিয়া তাঁদের হর্ণ এন্টেনায় সব দিক থেকে যে পটভূমি বিকিরণ পাচ্ছিলেন মেপে দেখা গেল তা ঠিক মাইক্রোওয়েভের তরঙ্গ-দৈর্ঘে ঠিক সেই মাপের যা বিগ্ ব্যাং তত্ত্ব ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছে। উত্তাপ মেপে দেখা গেল তাও ঠিক ৩ ডিগ্রি কেলভিন। অর্থাৎ এইই তো বিগ্ ব্যাং কালীন সেইই বিকিরণ চৌদ্দ শত কোটি বছর আগের মুক্ত হওয়া সেইই প্রাগৈতিহাসিক শক্তির আজকের চিহ্ন। এতো বিগ্ ব্যাং এরই জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী!

অতি ঠান্ডা এই বিকিরণের প্রকৃতি দেখে বুঝা গেল একটি সম্পূর্ণ কালো বস্তু থেকে তাপ বিকীর্ণ হলে পদার্থবিদ্যার সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মে যেমনটি হবার কথা এটি ঠিক তাই। ঐ বিকিরণের শক্তিটি যে আদিতে তাপশক্তি ছিল তা এর মাধ্যমে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে। তাছাড়া এরকম নিঁখুত 'কৃষ্ণ বস্তু বিকিরণ' একমাত্র সে সময়ের অত্যন্ত উচ্চ উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেই সম্ভব। কাজেই তার শৈশবে মহাবিশ্ব যে অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল তাও এর থেকে স্পষ্ট।

পরবর্তীতে আরো সূক্ষ্ম পরিমাপে বুঝা গেল মহাবিশ্ব সৃষ্টির আদি কাল থেকে এর প্রসারণের ইতিহাস ধারণ করা এই বিকিরণ সব সময় পুরো মহাবিশ্বকে পরিব্যক্ত করে রেখেছে। সে কারণে আজও একটি সর্বব্যাপ্ত পটভূমি হিসেবে একে পাওয়া যাচ্ছে, বিগ্ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী ঠিক যেসব গুণ নিয়ে পাওয়া যাওয়া উচিত সেভাবেই। এর নাম দেয়া হলো কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড, মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি সংক্ষেপে CMB। এর উৎস সেই মহাজাগতিক ঘটনা বিগ্ ব্যাং এ হওয়াতে, এবং এটি বিশ্বের সর্বব্যাপ্ত পটভূমি হিসাবে থাকার কারণেই এই নাম। প্রত্নতাত্ত্বিকরা সুদূর অতীতের কোন প্রাণির ফসিল দেখে তার সেদিনের অস্থিত্ব যেমন করে আজ বুঝতে পারেন, মহাজাগতিক ইতিহাস থেকে আসা ফসিলের মত এই CMB থেকেই যেন আমরা আজ নিশ্চিত হতে পারছি চৌদ্দ শত কোটি বছর আগে ঘটা সেই বিগ্ ব্যাং সম্পর্কে। কাজেই বিগ্ ব্যাং তত্ত্ব নিয়ে যেটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিল, CMB আবিষ্কারের পর পর

তা দূর হয়ে গেছে।

বিশ্ব সৃষ্টির সাক্ষ্য এই CMB'র সাক্ষাৎ কিন্তু আপনিও প্রতিদিন পাচ্ছেন, যদিও তাকে হয়তো এতদিন সেভাবে চিনতেননা। টেলিভিশন দেখার সময় যদি কখনো চ্যানেল না থাকে তখন আমরা এতে শুধু ঝির ঝির করা পর্দাটি দেখি, এক রকম শব্দও শুনি। এই ঝির ঝির করার মধ্যে কিছুটা রয়েছে টেলিভিশনের মধ্যেকার সার্কিট থেকে আসা ইলেকট্রনিক নয়েজ। কিন্তু তার সঙ্গে বেশ খানিকটা মেশানো রয়েছে CMB, টেলিভিশনের গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে যা ঝির ঝিরে আলোতে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ চৌদ্দ শত কোটি বছর ইতোমধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজও আমরা সেই সৃষ্টির আদিকালে মুক্ত হওয়া বিকিরণের সাক্ষ্যের মধ্যে ডুবে রয়েছি, এবং আমাদের বাসায় বসে টেলিভিশনের দিকে তাকালেই সেই বিগ-ব্যাং তত্ত্ব বর্ণিত ঘটনাগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।

সেখানেই রয়েছে আমাদের শিকড়

বিগ্ ব্যাং এর মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর থেকে এটি এমন সব ঘটনা ও সংকট অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে যার যে কোনটি একটু এদিক ওদিক হলে আমরা আসতে পারতামনা। কারণ তেমনটি হলে সৃষ্টি হতোনা তারা, গ্রহ, আমাদের সূর্য ও পৃথিবী, প্রাণ আসতোনা, আমরা আসতামনা। শুধু তাই নয়, আমাদের দেহ তৈরি যে সব মৌলিক পদার্থ নিয়ে সেগুলো তৈরির উৎসও মহাবিশ্বের ঐ ইতিহাসের নানা পর্যায়ে। সেগুলোর কোনটিই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে মহাবিশ্বের মহাজগতে।

প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থ বা মৌলের এক একটি নির্দিষ্ট গঠনের পরমাণু রয়েছে– যা একটির থেকে অন্যটি আলাদা, বিশেষ করে তার প্রোটন সংখ্যায়। এসব মৌলের নানা সমন্বয়ে নানা যৌগিক পদার্থের গড়া আর ভাঙা চলতে পারে নানা রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ায়। এটি প্রকৃতিতে সব সময় ঘটছে। আমাদের দেহেও ঘটছে। কিন্তু এর মধ্যে মৌল বা পরমাণু সাধারণত পরিবর্তিত হয়না–এরা চিরকাল অক্ষয়। অর্থাৎ মহাকালের গর্ভে মহাবিশ্বের কোন সুদূর কোণায় যে পরমাণুটির জন্ম হয়েছিল সেটিই হয়তো বহু হাত গড়িয়ে, বহু কিছুর মধ্যে রিসাইক্লিং হয়ে আজ আমার দেহে স্থান নিয়েছে। আমার দেহের সকল পরমাণুই এভাবে মহাবিশ্বের কোথাও না কোথাও সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের মহাজাগতিক শিকড় তাই মহাবিশ্বের ঐ ইতিহাসে।

আমরা পরে দেখবো বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলো সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্বের ইতিহাসে তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে। আসলে মৌল সৃষ্টির রহস্যের উন্মোচন এই ইতিহাস উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বড় ভূমিকা পালন করেছে। যে দুটি মৌল মহাবিশ্বে সব চেয়ে বেশি রয়েছে সেগুলো হলো হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। আর এরা সৃষ্টি হয়েছে একেবারে বিগ্ ব্যাং এর সময়েই সৃষ্টির প্রথম উন্মেষ কালে। আমরা দেখবো বিগ ব্যাং এর স্বপক্ষে যে ক'টি বড় প্রমাণ রয়েছে, বিশ্বে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের অনুপাত সম্পর্কে এ তত্ত্বের দ্বারা সঠিকভাবে ভবিষ্যৎদ্বাণী করতে পারা তার মধ্যে অন্যতম। হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম সব চেয়ে হালকা মৌল। ভরের তালিকায় পরের মৌল

লিথিয়ামও খুব অল্প কিছু বিগ্ ব্যাং-এর সময় সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর পরের ভারি বেশ কয়েকটি মৌলের জন্ম তারার কেন্দ্রে। পর পর এগুলো সেখানে সৃষ্টি হয়েছে থার্মোনিউক্লিয়ার পদ্ধতিতে তারার শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায়– যেটি মূলত হাইড্রোজেন বোমার অনুরূপ পদ্ধতি। এভাবে কার্বন, অক্সিজেন, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি হয়ে সব চেয়ে ভারী যে মৌল তারার মধ্যে তৈরি হতে পেরেছে তা হলো লোহা। লোহা পর্যন্ত নয়টি মৌলই দখল করে আছে মহাবিশ্বের ৯৯.৯ শতাংশ। কিন্তু অনুপাতে সামান্য হলেও এর চেয়ে ভারী মৌলগুলোরও কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে– কোন কোনটি আমাদের দেহ গঠনেও। মোট ৯২টি মৌলের ৮৩টি এই দলে। আর তাদের সৃষ্টি তারার জীবনকালে নয়, বরং শেষ বয়সে অনেক তারা যখন হঠাৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠে একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে– সেই সুপারনোভায়।

সেখানে ঐ ভারী মৌলগুলোর সৃষ্টি হয়। বিস্ফোরণের ফলে আগের পরের সব মৌল ছিটিয়ে পড়ে তারাগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গায়। সেগুলো থেকে সৃষ্টি হয় আবার নূতন প্রজন্মের তারা এবং তাদের গ্রহ-উপগ্রহ। তারার জগতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এভাবে চলতে থাকে। আমাদের পৃথিবীও এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে, আর তারই নানা উপাদানে আমাদের দেহগঠন হয়েছে। এভাবেই মহাবিশ্বের নানা পর্যায়ে না জায়গায় যে মৌল তৈরি হয়েছে সেগুলোই এখন আমাদের দেহের অংশ– কোনটি বিগ্ ব্যাং এ সৃষ্ট, কোনটি তারার কেন্দ্রে, আর কোনটি সুপারনোভার বিস্ফোরণে।

মহাজগতের ব্যাপ্তির সঙ্গে আমাদের দেহ গঠনের সম্পর্কটাই তার সঙ্গে আমাদের একমাত্র সম্পর্ক নয়। যেমনটি বলেছি মহাবিশ্বের নানা পর্যায়ে অনেকগুলো প্রক্রিয়া এমনভাবে ঘটেছে যার একটু এদিক ওদিক হলে আমরা আসতে পারতামনা। যেন আমরা আসার জন্যই একেবারে ঠিক ঠাক ঐ ভাবেই এগিয়েছে মহাবিশ্বের ইতিহাস। একে অনেকে বলেছেন মহাবিশ্বের 'মানব-মুখিতা'। অনেকে আবার বলছেন আমরাই বিজ্ঞান চর্চা করে এই ইতিহাস উদ্ধার করছি বলেই এরকম মনে হচ্ছে। সে যাই হোক মহাবিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে অঙ্গাঙ্গিক সে প্রমাণ আমরা পদে পদে পাব। আমাদের শিকড় নানা ভাবে মহাবিশ্বে প্রোথিত। মহাবিশ্বের কাহিনী তাই আমাদের কাহিনীর চেয়ে আলাদা কিছু নয়।

সুদূরের পিয়াসী

ঐ তারাটি কত দূরে ?

জন্মের মুহূর্ত থেকে প্রসারিত হয়ে হয়ে মহাবিশ্ব আজ প্রকান্ড অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। তার বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে লক্ষকোটি গ্যালাক্সির একটি সাধারণ গ্যালাক্সিতে একটি নগণ্য তারার গ্রহ পৃথিবীতে আমাদের বাস। সেখান থেকে এই মহাবিশ্বের যে কিনারা পর্যন্ত আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণে আনতে পেরেছি তার দূরত্ব অকল্পনীয় রকম বিশাল, সাধারণ দূরত্বের এককে প্রকাশ করা কঠিন। তাই এ জাতীয় দূরত্বকে আমরা মাপি অলোক-বর্ষের হিসাবে– সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে চলা আলো এক বছরে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটিই এক আলোক-বর্ষ। আর এখন মহাবিশ্বের সবচেয়ে দূরের যে উজ্জ্বল জিনিসগুলোকে আমরা সরাসরি উদ্ঘাটন করতে পারছি সেগুলো হলো কোয়াজার নামক তারা। সাধারণ তারার চেয়ে প্রায় এক শত কোটি গুণ বেশি উজ্জ্বল বলে তাদের পাঠানো রেডিও তরঙ্গ আমাদের রেডিও টেলিস্কোপে ধরা পড়ছে। আর সব চেয়ে দূরের দেখা এই কোয়াজারের দূরত্ব হচ্ছে এক হাজার কোটি আলোক-বর্ষ। সেখান থেকে আমাদের কাছে আলো আসতেই লেগে যায় এক হাজার কোটি বছর। অর্থাৎ কিনা এখন তাকে যে ভাবে দেখছি, সেটি ঐ বিশাল সময় আগের পরিস্থিতি। বুঝতে কষ্ট হয়না, এই অভাবনীয় পর্যবেক্ষণ শক্তি আমরা একদিনে পাইনি।

এটি আমরা ধীরে ধীরে অর্জন করেছি অনুসন্ধিৎসু মানুষের বহু হাজার বছরের আকাশ পর্যবেক্ষণের ধারাবাহিকতায়। সেই সুমেরীয় এবং গ্রীক জ্যোতির্বিদদের আমল থেকেই বিজ্ঞানীরা চাঁদ, সূর্য, গ্রহগুলোর গতিবিধি নিঁখুতভাবে পরিমাপ করার উপায় উদ্ভাবন করেছেন এবং পৃথিবী থেকে সেগুলোর দূরত্বও প্রায় নিঁখুতভাবে নির্ণয় করেছেন। এই নির্ণয়ে যে পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি আমাদের খুব অপরিচিত নয়, একে বলা হয় প্যারালাক্স পদ্ধতি। আমাদের দেশে ভূমি জরীপকারীরাও এই পদ্ধতিতেই দূরের কোন গাছ, থাম বা এমনি কোন বস্তুর দূরত্ব পরিমাপ করে থাকেন। এতে দুটি বিভিন্ন স্থান থেকে ঐ একই বস্তুটিকে লক্ষ্য করা হয়, এবং তাতে আপাতদৃষ্টিতে বস্তুটির অবস্থান কিছুটা সরে যায়। ঐ প্রত্যেক স্থান থেকে দেখা বস্তুটির আপাত অবস্থান থেকে সেই স্থানে টানা সরল রেখা দুটি পরস্পরের সঙ্গে যে কোণ তৈরি করে তা মাপতে হয়। যে দুই স্থান থেকে দেখা হলো তাদের মধ্যে দূরত্ব জানা থাকতে হয়। এগুলো থেকে ত্রিকোণমিতির নিয়ম অনুযায়ী দেখা বস্তুটির দূরত্ব হিসাব করে বের করা যায়। যে দুটি স্থান থেকে বস্তুটি

লক্ষ্য করা হবে তারা পরস্পর থেকে যত দূরে হবে ঐ কোণটি তত বড় হবে। আবার লক্ষ্য করার বস্তুটি যত বেশি দূরে হবে ঐ কোণটি তত ছোট হবে ও তা মাপা কঠিন হয়ে পড়বে। বুঝাই যাচ্ছে যত দূরের বস্তু মাপতে চাইবো ততই আমাদের পর্যবেক্ষণের জন্য এমন দুটি স্থান প্রয়োজন হবে যার একটি অন্যটি থেকে অনেক দূরে হবে। ভূমি জরীপের সময় এই দূরত্ব অল্প হলেই চলে– যেমন কয়েক মিটার দীর্ঘ একটি দন্ডের দুই প্রান্ত থেকে দেখে দূরের একটি গাছের দূরত্ব এভাবে মাপা যায়। চাঁদ বা নিকটবর্তী গ্রহগুলোর দূরত্ব মাপতে হলে ঐ কয়েক মিটারে কাজ হয়না। কারণ তাহলে কোণটি এত ছোট হবে যে মাপার প্রশ্নই উঠবেনা। পৃথিবীর পৃষ্ঠে দুই বিভিন্ন অঞ্চলে থাকা দুটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে একই সময়ে চাঁদ বা গ্রহটিকে দেখে প্রত্যেকটি কেন্দ্র থেকে তাদের আপাত অবস্থান রেকর্ড করে, তারপর ত্রিকোণমিতি কষে এই দূরত্ব বের করা যায়। কারণ তখন কোণটি মাপার মত বড় হয়। এবং তা সেই প্রাচীন গ্রীক আমলেই যথেষ্ট শুদ্ধ ভাবে করা গেছে। এর পর ১৭০০ শতকে সূর্যের দূরত্বও মোটামুটি নিঁখুতভাবে মাপা সম্ভব হয়েছে।

তারার যে দূরত্ব তা মাপতে অবশ্য পৃথিবী পৃষ্ঠের পরস্পর সবচেয়ে বেশি দূরে থাকা দুটি কেন্দ্র নিয়েও সুবিধা হয়না। সূর্যের দূরত্ব জানার ফলে অন্তত কাছাকাছি তারাগুলোর দূরত্ব মাপার সুবিধা হয়ে গেল পরস্পর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত দুটি অভিনব পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের দূরত্ব এর থেকে জানা গেল বলে। পৃথিবীর বার্ষিক গতিতে কোন এক সময় পৃথিবী যেখানে থাকে তা তার ঠিক ছয় মাস পর সূর্যের অন্য পাশে গিয়ে তার অবস্থান স্থল থেকে কত দূরে সেটি সঠিক ভাবে এখন নির্ণয় করা গেলো। যেহেতু পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার, ছয় মাসের ব্যবধানে সূর্যের দুই পাশে পৃথিবীর দুই অবস্থানের দূরত্ব হয় ৩০ কোটি কিলোমিটার। এভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য বিশাল দূরত্ব থাকা দুটি অবস্থান পেয়ে যাওয়াতে প্যারালাক্স পদ্ধতি দারুণ কার্যক্ষম হতে পারলো। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ জানতো যে দৃশ্যমান গ্রহ ও তারাকে মোটামুটি

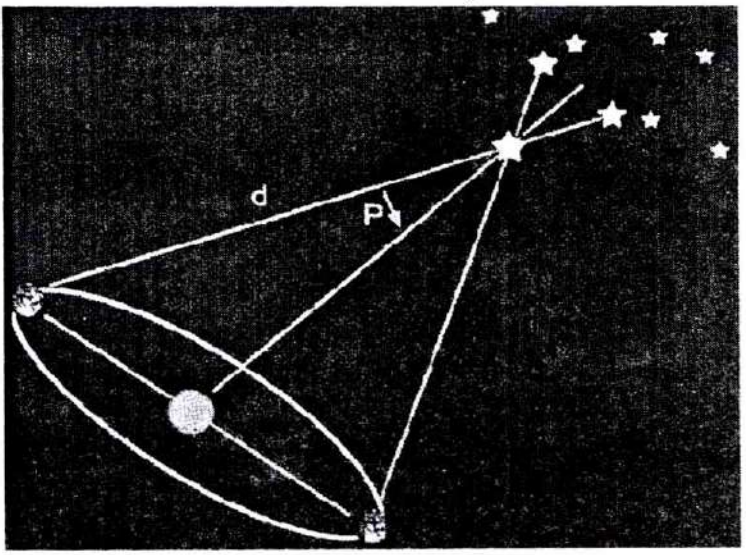

সূর্যের দুদিকে পৃথিবীর দুই বিপরীত অবস্থান থেকে
তারার প্যারালাক্স (p) এবং তা থেকে তারা দূরুত্ব (d)।

একই রকম মনে হলেও এবং একই আকারে আকাশে দেখা গেলেও তারার দূরত্ব গ্রহের থেকে অনেক বেশি। পৃথিবীর দুই দূরবর্তী স্থান থেকে দেখলে গ্রহের আপাত অবস্থান পরিবর্তন হলেও তারার অবস্থানে যে কোন হেরফের হয় না তা দেখেই সেটি বুঝা গেছে। তখন থেকেই প্রশ্ন ছিল ঐ তারাটি কত দূরে? কিন্তু সেদিন তার কোন উত্তর ছিলনা। পরস্পর থেকে ৩০ কোটি কিলোমিটার দূরের দুটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র পেয়ে যাওয়াতে তার কিছু উত্তর পাওয়া গেল।

প্যারালাক্স পদ্ধতিতে তারার দূরত্ব

কোণ মাপা হয় ডিগ্রিতে। খুব সূক্ষ্ম কোণ মাপতে এক ডিগ্রির ৬০ ভাগের এক ভাগকে বলা হয় এক মিনিট। আরো সূক্ষ্ম কোণের জন্য এক মিনিটের ৬০ ভাগের এক ভাগ কোণকে বলা হয় এক সেকেন্ড। একেবারে নিকটতম তারার দূরত্বও মাপতে গিয়ে সূর্যের দুই পাশে পৃথিবীর অবস্থানের পরস্পর ৩০ কোটি কিলোমিটার দূরত্বে পৃথিবীর দুটি অবস্থান থেকে (অর্থাৎ প্রথমটির ৬ মাস পরে দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণটি করে) তারাটিকে দেখে যে প্যারালাক্স কোণ আমরা পাই তাও দুই এক সেকেন্ডের চেয়ে বড় কোণ হয়না– যাকে কোন রকমে মাত্র মাপা যেতে পারে। এই পরিমাপের ফলে তারার দূরত্ব আমরা আরো একটি এককে মাপতে পারি। আমাদের কাছে দুটি অবস্থানের এই যে দীর্ঘতম দূরত্ব আছে সেই ৩০ কোটি কিলোমিটারের এদিক আর ওদিক থেকে দেখে একটি তারাকে যদি আমরা প্যারাল্যাক্স পদ্ধতিতে দুই সেকেন্ড কোণ তৈরি করতে দেখি, তা হলে তার দূরত্বকে বলবো এক প্যারসেক দূরত্ব– যা প্যারালাক্স সেকেন্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ। এক প্যারসেক দূরত্ব প্রায় ৩০ লক্ষ কোটি কিলোমিটার যা কিনা ৩.২৬ আলোক-বর্ষের সমান। কোণ যদি এর অর্ধেক হয় তাহলে দূরত্ব হবে দুই প্যারসেক। এভাবে কোণ যত ছোট হবে দূরত্ব হবে তত বেশি প্যারসেক।

তারার অবস্থানের ক্ষেত্রে এক সেকেন্ডের মতো বা তার চেয়ে ছোট অতি সূক্ষ্ম কোণ মাপতে গিয়ে নানা বিপত্তি দেখা যায়। যেমন এ ধরণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্যারালাক্স ছাড়া অন্য কারণেও সময়ের সঙ্গে তারার আপাত অবস্থানে পরিবর্তন হয়। পৃথিবী যেহেতু বার্ষিক গতিতে এগিয়ে চলেছে এর উপর এসে পড়া আলো তাই কিছুটা হেলে পড়ে। যেরকম বৃষ্টি যদিও উপর থেকে সোজা পড়ে, বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার সময় তা আমাদের কিছুটা হেলে সামনের দিক থেকে আমাদের মুখের উপর এসে পড়ে। আলো হেলে আসাটিও অনেকটা একই রকমের। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিকে চলছে বলে এই হেলে যাওয়াটিও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে। যদিও দ্রুত গতিতে আসছে বলে আলোর ক্ষেত্রে হেলে যাওয়াটি মোটেও বৃষ্টির মত প্রকট হবেনা, তবুও সূক্ষ্ম প্যারালাক্স মাপার ক্ষেত্রে আপাত অবস্থানের এই পার্থক্য পরিমাপটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুল সৃষ্টি করে। এই ভুল শুদ্ধ করার জন্য নিঁখুত হিসাব নিকাশ করতে হয়েছে।

আরো একটি বিপত্তি হলো পৃথিবী একেবারে গোলকাকার না হয়ে উত্তর-দক্ষিণে খানিকটা চাপা হওয়ার কারণে এর ঘূর্ণনে খানিকটা টালমাটাল অবস্থা থাকে। এর ফলেও তারার আপাত অবস্থানে খানিকটা ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ঐ টালমাটাল নড়াচড়ার সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাব করে, এই ভুলও শুদ্ধ করা সম্ভব হলো। এভাবে সেই সূক্ষ্ম প্যারালাক্স কোণকেও

নিঁখুতভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হলো এক সেকেন্ডেরও ছোট হওয়া সত্ত্বেও। পৃথিবীর সব চেয়ে কাছের তারা আলফা সেন্টাউরের দূরত্ব পাওয়া গেল ১.৩২ প্যারসেক অর্থাৎ ৪.২৯ আলোক- বর্ষ। কোণ পরিমাপ পদ্ধতি আরো সক্ষম হয়ে উঠলে ৩০ প্যারসেক পর্যন্ত দূরত্বে থাকা তারাগুলোর দূরত্ব মাপা সম্ভব হলো যদিও সে কোণ অতি ছোট। অথচ এগুলোতো নেহাৎ আমাদের কাছের তারাগুলোর কথা একেবারে কাছে ধারে রয়েছে। এর বাইরেইতো পড়ে রয়েছে বাকি মহাকাশ। সেখানকার দূরত্বগুলোর কী হবে?

একটির দূরত্ব থেকে পরবর্তীটির দূরত্ব জানা

বিভিন্ন তারার আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে ঐ তারার বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। প্রিজমের মাধ্যমে যে ভাবে বর্ণালী সৃষ্টি করা হয় এও সেই বর্ণালী। তবে আরো সূক্ষ্ম ব্যবস্থায় এর নানা অংশকে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুযায়ী সরু লাইনের আকারে পাওয়া যায় যার একই প্যাটার্ন একই রকম ঔজ্জ্বল্যের পরিচায়ক। কাজেই যেসব তারার বর্ণালী একই ধরনের, আমরা ধরে নিতে পারি যে তাদের সবগুলোর প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য একই। কিন্তু এই একই ঔজ্জ্বল্য পৃথিবী থেকে আমরা দেখিনা–দূরত্বের উপর নির্ভর করে দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্য বেশ কিছুটা কম বেশি হয়।

প্যারালাক্স পদ্ধতিতে দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব হয়েছে এমন একটি তারার মত একই বর্ণালীযুক্ত তারার প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য উভয়ের একই হওয়ার কথা। কিন্তু তার দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্য যদি জানা দূরত্বের তারাটির চেয়ে কম হয় তা হলে বুঝতে হবে সেটির দূরত্ব অধিক। এই দুই তারার দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্যের তুলনা করে এদের দূরত্বের অনুপাতটিও জানা যায় এবং দূরবর্তী তারাটির দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। এ ভাবে জানা তারার দূরত্ব থেকে আমরা ক্রমাগত আরো দূরের তারার দূরত্ব নির্ণয় করতে পারি দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্যের পরিমাপ করে।

ঔজ্জ্বল্যের পরিমাপের ক্ষেত্রে গত শতাব্দিতে একটি বড় সক্ষমতা নিয়ে এসেছে শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সঙ্গে ফটোগ্রাফির ব্যবহারের সুযোগ। সরাসরি দেখার চেয়ে এর সুবিধা অনেক বেশি। এর ফলে সবকিছুর স্থায়ী রেকর্ড রাখা যায়– তাতে ঔজ্জ্বল্য, পারস্পরিক অবস্থান ইত্যাদির রেকর্ড ধীরে সুস্থে পরে পরিমাপ করা যায় যথাযথ কৌশল ব্যবহার করে। একটি নির্দিষ্ট আলোর কম হলে কোন কিছু চোখে ধরা পড়েনা। কিন্তু খুবই কম আলোও অনেক্ষণ ধরে পড়ে ফটোগ্রাফিক ফিল্মে দাগ রাখতে সক্ষম। এভাবে অনেক দূরের তারার একেবারে নিস্প্রভ ও অদৃশ্য তারাগুলোকেও ঔজ্জ্বল্য ও দূরত্ব পরিমাপের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

আকাশে তারার কোন কোন গুচ্ছের বিভিন্ন তারার গতিবিধি দেখে ও বর্ণালী বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে তাদের দূরত্ব মোটামুটি একই, এর মধ্যে নানা রকমের নানা ঔজ্জ্বল্যের তারা থাকা সত্ত্বেও। অভাবনীয় রকম অধিক দূরত্বের তারা ও গ্যালাক্সির দূরত্ব নির্ণয়ে বড় অগ্রগতি এনে দিয়েছে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনশীল ঔজ্জ্বল্যের তারাগুলোকে ব্যবহার করে। এদেরকে বলা হয় সেফেইড তারা। এদের বৈশিষ্ট হলো অল্প সময়ের মধ্যেই পর্যায়ক্রমে এদের দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্য বাড়তে আর কমতে থাকে। এভাবে বাড়া কমার পর্যায়-কাল (পিরিয়ড) এক একটির ক্ষেত্রে এক এক রকমের– কোন কোনটির

দুই এক দিন আবার কোন কোনটির ১০০ দিনও হতে পারে। অসংখ্য তারার ঔজ্জ্বল্য ফটোগ্রাফিক ফিল্মে তাদের ছবি থেকে নির্ণয় করাটি খুব সময় ও ধৈর্য সাপেক্ষ কাজ। ১৯০২ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে এই কাজটিতে নিয়োজিত ছিল মেয়েদের এক একটি দল যাদেরকে সবাই 'কম্পিউটার গার্ল' এই নামে ডাকতো। মজার ব্যাপার হলো নিজে বিজ্ঞানী না হয়েও এই কম্পিউটার গার্লদের একজন লক্ষ্য করলেন যে সেফেইড তারাগুলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়াকমার পর্যায়কালের সঙ্গে তাদের দৃশ্যমান গড় ঔজ্জ্বল্যের একটি চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। হেনরিয়েটা লীভিট নামের এই মহিলা বিশেষ একদল তারার মধ্যে বেশ কিছু সেফেইড তারা খুঁজে পেলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও মনোযোগ সহকারে এগুলোর পর্যায়কাল ও ঔজ্জ্বল্য পরিমাপ করে দেখালেন যে গড় ঔজ্জ্বল্য যত বেশি এর পর্যায়কাল হয় তত বড়, অর্থাৎ তত ধীরে এর ঔজ্জ্বল্য বাড়ে কমে। উভয়ের মধ্যে সরল সম্পর্কটি তিনি চমৎকারভাবে নির্ণয় করে ফেল্লেন একটি গ্রাফে প্রত্যেকটির ঔজ্জ্বল্য ও পর্যায়কাল অনুযায়ী বিন্দু স্থাপন করে। বিন্দুগুলো যে রকম রেখা তৈরি করে তাতে যে কোন সেফেইড তারার পর্যায়কাল জানা থাকলে তার দৃশ্যমান গড় ঔজ্জ্বল্য এই গ্রাফ থেকেই বের করে ফেলা যায়। এই গ্রাফ আকাশের যে কোন দূরত্বে যে কোন সেফেইড তারার জন্যই প্রযোজ্য, কারণ নিয়মটি ঐ রকম তারার মৌলিক প্রক্রিয়া সমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি বিশেষ দলের সব তারা পরস্পরের কাছাকাছি বলে পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব একই বলে ধরে নেয়া যায়। একারণে এদের দৃশ্যমান গড় ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে এদের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যের সম্পর্কটি সব তারার জন্য ঠিক একই। ফলে তাদের আপেক্ষিক প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য আপেক্ষিক দৃশ্যমান ঔজ্জ্বলেরই অনুরূপ। কিন্তু যেটা তখনো জানা গেলনা তা হলো সত্যিই এদের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যগুলো কী? সেটি একটির ক্ষেত্রে জানা গেলে আপেক্ষিক ঔজ্জ্বল্য থেকে সব কটিরই জানা যাবে। পরে পৃথিবী থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক কাছে একটি সেফেইড তারা খুঁজে পাওয়া গেল যার দূরত্ব অন্য উপায়েই নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এই দূরত্ব ও দৃশ্যমান ঔজ্জ্বলের পরিমাপ থেকে এর প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য হিসাব করে জানা গেল। আর লীভিটের গ্রাফে এর পর্যায়কালের বরাবর বিন্দুটির দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্যকে এই প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যে নিয়ে গিয়ে, এবং আনুপাতিক হারে অন্য বিন্দুগুলোকেও পরিবর্তন করে নিয়ে লীভিটের গ্রাফের সব বিন্দুকে এর দ্বারা প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যে রূপান্তরিত করা গেল। এবার লীভিটের গ্রাফ পর্যায়কাল থেকে প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যও বলে দিতে পারলো। যে কোন তারা দলে একটি মাত্র সেফেইড তারা খুঁজে পেলেও তার দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্য মেপে ও লীভিটের গ্রাফ থেকে পর্যায়কাল বরাবর প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য জেনে নিয়ে, এবং উভয় ঔজ্জ্বল্যের তুলনা করে পুরো দলের সব তারার দূরত্ব পাওয়া যায়।

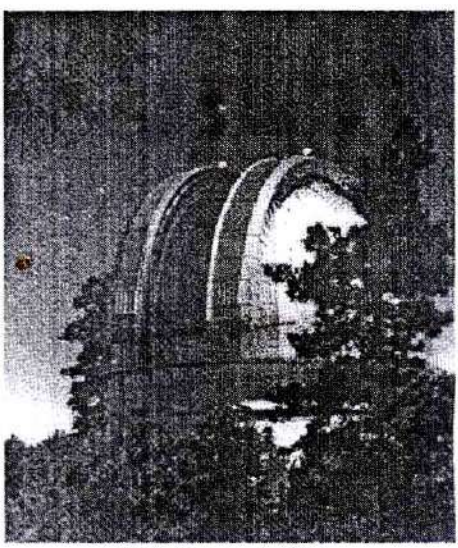

মাউন্ট উইলসন মানমন্দির

কৌতুহল জাগা স্বাভাবিক, সেফেইড তারার ঔজ্জ্বল্য বাড়াকমার ঐ মৌলিক প্রক্রিয়াগুলো কী? অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতে দুটি কাছাকাছি তারা ক্রমাগত একটি অন্যটিকে আবর্তন করে পর্যায়ক্রমে একে অন্যকে ঢেকে ফেরার মাধ্যমে ঔজ্জ্বল্য বাড়ে কমে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তারার আভ্যন্তরীণ শক্তি তৈরির প্রক্রিয়ায় এটি ক্রমান্বয়ে ঔজ্জ্বল্যে ফুঁসে উঠে আবার ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। উজ্জ্বলতর তারায় এটি যে ধীরে ঘটে তাও এই প্রক্রিয়াগুলোরই ফলশ্রুতি।

ষ্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডাল

আগেকার দিনে বিশেষভাবে কিছু মোমবাতি তৈরি হতো যার ঔজ্জ্বল্যকে অন্যান্য সব বাতির ঔজ্জ্বল্যের পরিমাপে একটি প্রমিত মাপ বলে মনে করা হতো। এদের তাই বলা হতো ষ্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডাল। এদের সঙ্গে তুলনা করে অন্য যে কোন বাতির ঔজ্জ্বল্য জানা যেত। অত্যন্ত দূরের তারার দূরত্ব মাপার ক্ষেত্রে অনেকটা এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হলো।

এক সময় পরিচিত মহাকাশ বলতে আমরা আমাদের ছায়াপথকেই বুঝতাম যেটি আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সি, লক্ষ লক্ষ তারায় গঠিত। সেফেইড তারার সাহায্য নিয়ে ক্রমাগত অধিক দূরে যে সব তারাপুঞ্জের দূরত্ব পরিমাপ করা হচ্ছিল প্রথমে তার সবগুলোকে আমাদের এই ছায়াপথেরই অংশ বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু শিগ্‌গির বুঝা গেল এদের অনেকগুলো আমাদের ছায়াপথ থেকে অনেক দূরে আলাদা আলাদা গ্যালাক্সি। এ সময়কার অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে এসব কিছু কিছু গ্যালাক্সিতেও সেফেইড তারা আবিষ্কার করে তাদের মাধ্যমে এদের দূরত্বও নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে এ দূরত্ব ছায়াপথের পরিমাপকৃত আয়তনের তুলনায় অনেক অনেক বড়।

ছায়াপথের মধ্যেই ইতোপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে তারার কিছু দল সেখানে গোলকাকার প্যাটার্ন তৈরি করে যেন জড়াজড়ি করে আছে বহু হাজার থেকে বহু লক্ষ তারা। যদিও এদের বেশির ভাগেই কোন সেফেইড তারা নাই তবুও তাদের দূরত্ব পরিমাপ করা হলো একটি নূতন উপায়ে। নানা প্রমাণাদিতে ধরে নেয়া যৌক্তিক মনে হলো যে এরকম এক একটি দলে উজ্জ্বলতম তারাগুলোর প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য সব দলের ক্ষেত্রেই মোটামুটি একই। কাজেই সেফেইড তারা পাওয়া গেছে এমন দলের দূরত্ব পাওয়ার মাধ্যমে সে দলের উজ্জ্বলতম তারাটির প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য জেনে নেয়া যায় দূরত্ব আর দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্য থেকে হিসাব করে। এই ঔজ্জ্বল্যটিই হতে পারে আমাদের একটি ষ্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেল। এখন তারার ঐ গোলাকার দলগুলোর যেগুলোতে সেফেইড তারা নাই, তার দূরত্ব মাপাও কঠিন হলোনা। ওর উজ্জ্বলতম তারাটির দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্যটি মেপে নিলেই হলো। যেহেতু তার প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য ঐ ষ্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডালের সমান, কাজেই প্রকৃত ও দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্য তুলনা করে তারও দূরত্ব বের হয়ে পড়ে।

অন্য পরিস্থিতিতে অবশ্য খুঁজে নিতে হয়েছে ভিন্ন ষ্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডাল। ১৯২০ এর দশকেই যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট উইলসনের শক্তিশালী দূরবীক্ষণে আবিস্কৃত হলো যে সেফেইড তারার দ্বারা দূরত্ব পরিমাপ করে মোটামুটি একই দূরত্ব পাওয়া গেছে এমন দুটি গ্যালাক্সির

গ্যালাক্সিপুঞ্জ

দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্য প্রায় একই। অর্থাৎ এদের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যও একই। এর থেকে ধরে নেয়া গেল গড়পড়তা সব গ্যালাক্সিগুলোরই প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য আসলে খুব কাছাকাছি। আমরা যে কম বা বেশি ঔজ্জ্বল্য দেখি সেটি নেহাৎ দূরত্বের কমবেশি হবার কারণে। আমাদের নিজের গ্যালাক্সির বাইরের সব চেয়ে কাছের গ্যালাক্সি আন্দ্রোমেদার দূরত্ব পাওয়া গেল অবাক করা ২০ লক্ষ আলোক-বর্ষ। এভাবে ঔজ্জ্বল্যগুলো মাপার মাধ্যমে আরো অনেক অনেক দূরের গ্যালাক্সিগুলোরও দূরত্ব পাওয়া গেল।

দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর দূরত্ব পরিমাপে আর একটি ষ্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেল খুব সফল ও সূক্ষ্মভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো সুপারনোভা। আমরা দেখেছি সুপারনোভা হলো শেষ জীবনে তারার বিস্ফোরণ যার ফলে অত্যন্ত উচ্চ ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি হয়। এরকম সব সুপারনোভা একই প্রক্রিয়ায় বিস্ফোরিত হয় বলে তাদের সব কটির সৃষ্ট প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যও এক হয়। জানা দূরত্বে ঘটা সুপারনোভার ঔজ্জ্বল্যকে তাই ষ্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেল হিসাবে ব্যবহার করে অন্য যে কোন সুপারনোভার দূরত্ব বের করা সম্ভব। সুপারনোভা অত্যন্ত উজ্জ্বল বলে অনেক দূরের গ্যালাক্সিগুলোর দূরত্ব ও তার সুপারনোভার দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি।

দৃষ্টির সর্বদূরের সীমানায় কোয়াজার

যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট উইলসন এর ১০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ, মাউন্ট পালামোরের ২০০ইঞ্চি দূরবীক্ষণ এবং সাম্প্রতিক মহাশূন্যে পরিক্রমণরত হাবল স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ও মাপজোকের ফলে আমাদের জানা মহাবিশ্ব সাধারণ আলোকের দূরবীক্ষণেই অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিন্তু এর অনেকখানি অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে আর একটি আবিষ্কারের মাধ্যমে তা হলো রেডিও তারার এবং রেডিও দূরবীক্ষণের।

১৯৩০ এর দশকে দূরপাল্লার রেডিও যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত এন্টেনায় কাজ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা একটি একটানা হিস্‌স্‌ শব্দ পেয়ে একটু সচকিত হলেন। এগুলো যে সাধারণ কোন ইলেকট্রনিক বা অন্য কোন নয়েজ নয় সেটি তাঁরা বুঝলেন এন্টেনাকে

বিশেষ বিশেষ দিকে তাক করাতে শব্দের তীব্রতা বেড়ে যাওয়া দেখে। তাছাড়া দেখা গেল পৃথিবীর আহ্নিক গতি অর্থাৎ দিবা রাত্রির পর্যায়ক্রমের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দ বাড়ছে কমছে, কিন্তু সূর্যের সাপেক্ষে দিন-রাতের যে দৈর্ঘ ঠিক হয় তার হিসাবে নয় বরং তারার সাপেক্ষে সামান্য ভিন্ন সময়ের যে দিবারাত্রি হয় তার হিসাবে। এতে স্পষ্ট বুঝা গেল এর উৎস পৃথিবীতে বা সৌরমন্ডলের কোথাও নয়, এ শব্দের উৎস মহাবিশ্বে তারার জগতে। বিশেষ বিশেষ তারা বা গ্যালাক্সি থেকে রেডিও তরঙ্গ সিগন্যাল এসেই এই শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে বলে এভাবে উদ্ঘাটিত তারা ও গ্যালাক্সিকে রেডিও তারা, এবং রেডিও গ্যালাক্সি বলা হয়। এরপর থেকে রেডিও জ্যোতির্বিদ্যা নামে একটি নূতন গবেষণা বিষয়ই সৃষ্টি হয়ে গেল মহাকাশে রেডিও তারা ও রেডিও গ্যালাক্সির উদ্ঘাটন ও জরীপের কাজে। এজন্য এসেছে শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপ– তাদের কোন কোনটি বিশাল এলাকা জুড়ে অনেকগুলো সারিবদ্ধ এন্টেনার সমন্বয়ে তৈরি। এদের পক্ষে মহাবিশ্বের অতি দূর অঞ্চলের রেডিও গ্যালাক্সি থেকে আসা তরঙ্গ উদ্ঘাটন করা, তাদের সিগন্যালের প্রকৃতি ও তীব্রতা নির্ণয় করা সম্ভব হলো। ১৯৫০ এর দশকের শেষে এসে কয়েক শত কোটি আলোক-বর্ষ পর্যন্ত দূরের গ্যালাক্সিগুলোর তথ্য আমাদের জানা হয়ে গেল। মহাবিশ্বের আসল বিশাল ব্যাপ্তি বুঝার পথে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গেলাম। ঐ পর্যায়ে দূরত্ব নির্ণয়ের একটি বড় উপায় হলো ঐ গ্যালাক্সিগুলো থেকে আসা রেডিও বিকিরণের বর্ণালী বিশ্লেষণ করা। এই বর্ণালী যদি কম তরঙ্গ-দৈর্ঘের দিকে সরে আসে, যাকে বলা হয় লাল-সরণ, তা হলে

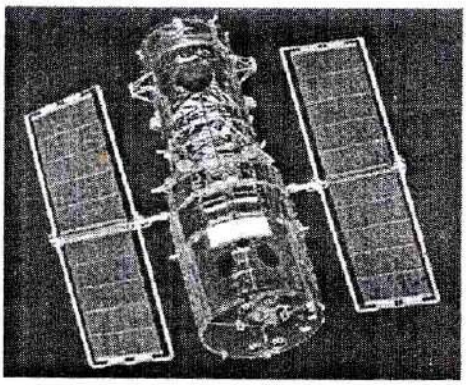

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ

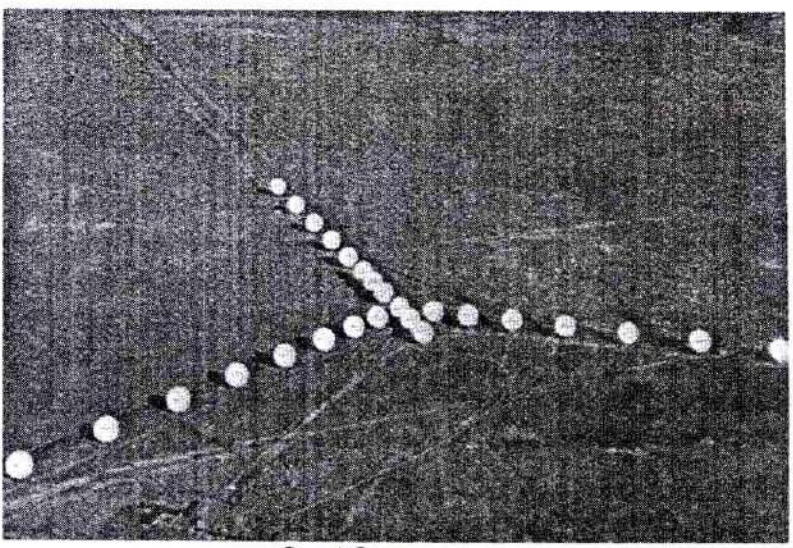

রেডিও টেলিস্কোপের সমাহার

গ্যালাক্সিটি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কোন গ্যালাক্সির বর্ণালীর লাল সরণের পরিমাণ দেখে জানা সম্ভব এটি কত দ্রুত সরে যাচ্ছে এবং তার থেকে আবার বুঝা যায় এটি কত দূরে রয়েছে। এই বিষয়টির বিস্তারিত একটু পর আমরা দেখবো।

১৯৬১ সনে এমন কিছু রেডিও গ্যালাক্সি সদৃশ মহাজাগতিক বস্তুর প্রথম সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলো নানা দিক থেকে খুবই চাঞ্চল্যকর। এদের বিকিরণের তীব্রতা অস্বাভাবিক রকমের বেশি– প্রায় হাজার গ্যালাক্সির সমান, মানে প্রায় দশ হাজার কোটি সূর্যের সমান! এদের নাম দেয়া হলো কোয়াজার। পরে এরকম হাজার হাজার কোয়াজার মহাবিশ্বের সব দিকে আবিস্কৃত হয়েছে– কিন্তু তাদের সবই অত্যন্ত সুদূর অঞ্চলে। এখন আমরা বুঝতে পাচ্ছি এই কোয়াজাররা মহাবিশ্বের একেবারে শুরুর দিকে সৃষ্ট জিনিস–মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে এরা এখন তার একেবারে কিনারার দিকে গিয়ে পৌঁছেছে। এদের বর্ণালী বিশ্লেষণ থেকে আরো বুঝা যাচ্ছে এরা অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে। এই উচ্চ উত্তাপের কারণটিও এখন বুঝা সম্ভব হয়েছে। গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বস্তুর অতি উচ্চ ঘনত্বের ফলে সেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এত বেশি হয় যে তার আকর্ষণ থেকে কোন কিছুই রক্ষা পায়না– এমনকি আলোও না। সকল বস্তু ও সকল বিকিরণকে এটি গিলে নেয় বলে এ ধরনের অবস্থাকে আমরা বলি ব্ল্যাক হোল। ব্ল্যাক হোলের সীমানার ভেতরে গেলে সব কিছু ওখানে বিলীন হয়ে যায় বটে কিন্তু ঐ সীমানার ঠিক বাইরে প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষণের সুপ্ত শক্তির অর্ধেকটা প্রচন্ড উত্তাপের সৃষ্টি করে– যাকে ব্ল্যাক হোলের চারিদিকে একটি রিং এর আকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল অবস্থায় দেখা যায়। ব্ল্যাক হোলের তত্ত্ব অনুযায়ী এর বাইরের দিকটি প্রধানত আলট্রা ভায়োলেট বিকিরণ দেবার কথা যা ঠিক কোয়াজারের বিকিরণের বর্ণালীর মত। বিগ্ ব্যাং এর অপেক্ষাকৃত অল্প কিছু সময় পর সৃষ্ট গ্যালাক্সিগুলোতে এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক হোলে যাবার মত বস্তুর পরিমাণ ওখানে কমে গেলে ঐ তীব্র উত্তাপ আর

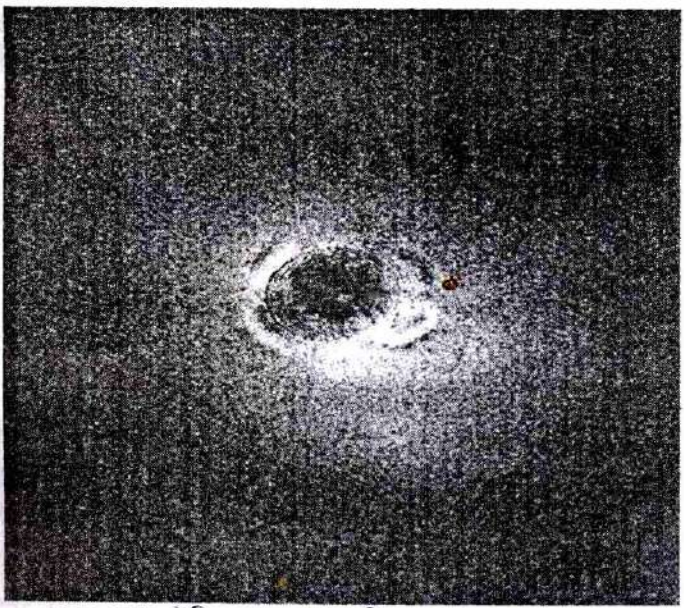

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ দেখা একটি কোয়াজার (মাঝখানে ব্ল্যাক হোল)

সৃষ্টি হতে পারেনি। তাই পরবর্তী সময়ের গ্যালাক্সিতে এই অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য আর থাকেনি।

কিন্তু কোয়াজারে আমরা যাদের পাচ্ছি তারা কিন্তু সেই প্রথম যুগের উজ্জ্বল গ্যালাক্সি। সর্ব দূরের কোয়াজারগুলো প্রায় এক হাজার কোটি আলোক-বর্ষ দূরে। মানে এদের থেকে আমাদের কাছে আলো আসতে লেগেছে এক হাজার কোটি বছর। যে কোয়াজারকে আমরা এখন দেখছি সেটি তার এক হাজার কোটি বছর আগের অবস্থা, অর্থাৎ বিগ্ ব্যাং এর মাত্র ৫০০ কোটি বছর পরের– মহাবিশ্বের ইতিহাসের প্রাথমিক অবস্থার।

ঐ কোয়াজারই আজ মহাবিশ্বের সব চেয়ে পুরানো গ্যালাক্সিগুলো যা আমরা দেখছি, আর সেই কারণে এরাই সব চেয়ে দূরের। বলতে গেলেই এরাই এখন আমাদের উদ্ঘাটিত মহাবিশ্বের কিনারা–এবং মহাবিশ্বের আধুনিক তত্ত্ব পৃথিবী থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারা মহাবিশ্বের যে শেষ কিনারা নির্ধারণ করে দেয় এদের মাধ্যমে আমরা তার বেশ কাছে চলে গেছি। এমন কিনারা চৌদ্দ শত কোটি আলোক-বর্ষের কাছাকাছি কোথাও–কারণ মহাবিশ্বের বয়স চৌদ্দ শত কোটি বছর। আলো বা অন্য কোন সিগন্যাল এর চেয়ে দূরের কোথাও থেকে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারেনা।

গ্যালাক্সি যদি ট্যাবলেট হতো

তারাগুলো বিশাল আকারের জিনিস। সে রকম শত শত কোটি তারার সমন্বয়ে গঠিত এক একটি গ্যালাক্সিতে সব তারার মাঝে মাঝে যে ফাঁকা জায়গা তারার আয়তনের তুলনায় সেটি অনেক অনেক বড়। কাজেই তারা আর ফাঁকা জায়গা মিলে গ্যালাক্সিগুলোর আকার অনেক বিশাল। বিভিন্ন গ্যালাক্সিগুলোর নিজেদের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা তা আবার গ্যালাক্সির তুলনায় অনেক বড়। যেমন আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সির থেকে নিকটতম গ্যালাক্সিটির দূরত্ব ২০ লক্ষ আলোক বর্ষ। কাজেই এভাবে হাজার হাজার কোটি গ্যালাক্সি ও তাদের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা নিয়ে গড়া মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি কল্পনা করতেও মাথা ঘুরে যাওয়ার কথা। এর মধ্যে ফাঁকা জায়গাই অবশ্য বেশি, তারার মত ঘন বস্তু কম। তবে তারার আকারের তুলনায় আন্ততারা ফাঁকা জায়গা যত বড়, গ্যালাক্সির আকারের তুলনায় আন্তগ্যালাক্সি ফাঁকা জায়গা অনেক কম। মহাবিশ্বে পুঞ্জীভূত বস্তু এবং তাদের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা কীভাবে সাজানো রয়েছে তাকে বুঝার জন্য একে আমাদের পরিচিত ব্যাপ্তির আয়তনে ছোট করে নেয়া কাল্পনিক মডেলের সাহায্য নেয়া যায়। এমন একটি হতে পারে ট্যাবলেট মডেল। এতে সূর্যকে যদি আমরা একটি এসপিরিন ট্যাবলেটের সমান আয়তনের কল্পনা করে নিই তা হলে সূর্যের নিকটতম অন্য তারাটি হবে ১৪০ কিলোমিটার দূরের আর একটা এসপিরিন ট্যাবলেট! অন্য সব তারার মধ্যেও পারস্পরিক দূরত্বও এমনিই হবে। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে মহাবিশ্বে অধিকাংশ জায়গা নেহাতই ফাঁকা জায়গা– আমাদের ক্ষুদ্রায়িত মডেলে দেড়-দু'শ কিলোমিটার দূরে দূরে এক একটি এসপিরিন ট্যাবলেট বৈ নয়।

এবার আমরা আমাদের মডেলটি একটু বদলাই। সূর্যকে নয় আমাদের নিজেদের পুরো

গ্যালাক্সি ছায়াপথটিকেই আমরা একটি এসপিরিন ট্যাবলেট কল্পনা করে নিই। সেক্ষেত্রে অবশ্য এর নিকটতম গ্যালাক্সিটি হবে ১৩ সেন্টিমিটার দূরে। আন্তগ্যালাক্সি ফাঁকা জায়গা যে তুলনামূলকভাবে অনেক কম তাই বুঝা যাচ্ছে এতে। এরকম কাছাকাছি অনেক গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত হয়েছে আমাদের স্থানীয় গ্যালাক্সিপুঞ্জ। এর পরের স্থানীয় গ্যালাক্সিপুঞ্জের দূরত্ব আমাদের মডেলে ৬০ সেন্টিমিটার। অবশ্য এসবের থেকে ৩ মিটার দূরে রয়েছে একটি ফুটবলের সমান আয়তনের (এই মডেলে) একটি বড় স্থানীয় গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জ যার মধ্যে ২০০টির মত গ্যালাক্সি রয়েছে। ২০ মিটার দূরে রয়েছে আরো বড় দূরবর্তী গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জ– যাতে বহু হাজার গ্যালাক্সি রয়েছে। আরো দূরে রয়েছে আরো বড় গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জ– যার এক একটা নিজেই ২০ মিটারের মত ব্যাসের।

আমাদের সব চেয়ে কাছের শক্তিশালী রেডিও গ্যালাক্সি সিগনাস-এ ৪৫ মিটার দূরে। সব চেয়ে দূরের দেখা কোয়াজার প্রায় ৩৫০ মিটার দূরে। আর পুরো মহাবিশ্বকে ধারণ করা যাবে মোটামুটি ১ কিলোমিটার ব্যাসের একটি গোলকে। এর মধ্যে তুলনামূলক ভাবে ঘন ঘনই রয়েছে নানা গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জ ও গ্যালাক্সিপুঞ্জ এবং গ্যালাক্সি। কিন্তু একটি ট্যাবলেটরূপী গ্যালাক্সির ভেতরেও কিন্তু বেশির ভাগই ফাঁকা জায়গা–কারণ এর মধ্যে তারাগুলো অনেক দূরে দূরে।

যে স্থানীয় গালাক্সিপুঞ্জের কথা বললাম তাদের পরস্পরের মধ্যে এবং এর ভেতরের গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ যথেষ্ট সবল, তাদের পারস্পরিক দূরত্ব পরিবর্তন হয়না। সেরকম গ্যালাক্সির ভেতরে তারাগুলোর মধ্যেও যথেষ্ট মাধ্যাকর্ষণ–তাদের দূরত্বও পরিবর্তন হয়না। কিন্তু এর পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে বড় গ্যালাক্সিপুঞ্জের পরস্পরের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ টান কম। দেখা গেছে যে ওরা পরস্পর থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে– তাই মহাবিশ্ব ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের ট্যাবলেট মডেলে মহাবিশ্ব এখন এক কিলোমিটার ব্যাসের হলেও, আগে ছোট ছিল। সামনে ক্রমাগত আরো বড় হবে। এবার ট্যাবলেট বিশ্ব থেকে আসল মহাবিশ্বের কথায় ফিরে গেলে সেখানে প্রসারমান বিশাল মহাবিশ্বকে আমরা দেখতে পাই। আমাদের দেখা সব চেয়ে দূরে কিনারায় থাকা অংশে রয়েছে কোয়াজারগুলো–এক হাজার কোটি আলোক বর্ষে দূরে, সেগুলো সবচেয়ে দ্রুত অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে আরো দূরে যাচ্ছে আমাদের থেকে।

মহাবিশ্বের প্রসারণ ও তার বয়স নির্ণয়

বর্ণালীর লাল-সরণ

মহাবিশ্বের একটি ক্ষুদ্র নগণ্য গ্রহে বসে এমন সব গ্যালাক্সির নানা তথ্য আমরা কীভাবে পাচ্ছি যার অনেকগুলো থেকে আমাদের কাছে আলো এসে পৌঁছতেই লেগে যায় এক হাজার কোটি বছর? এর একটি বড় উপায় হলো সেখান থেকে আসা বিকিরণের বর্ণালী বিশ্লেষণ। আমরা যে ছোট বেলায় কাচের প্রিজম দিয়ে সাদা আলোকে বিচ্ছুরিত করে বেনীআসহকলা এই নানা রঙে বিশ্লিষ্ট বর্ণালী দেখেছি– এই সেই বর্ণালী। দৃশ্যমান আলোকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ অনুযায়ী নানা অংশে এতে ভাগ করে ফেলা হয়– যার এক প্রান্তে বেগুনি সবচেয়ে ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ, আর অন্য প্রান্তে লাল সব চেয়ে বড় তরঙ্গ– দৈর্ঘ। একে আরো সুন্দর ভাবে করা যায় প্রিজমের বদলে কাচের উপর খুব ঘনঘন দাগকাটা গ্রেটিং দিয়ে। তখন রঙকে শুধু সাতটি নয় আরো চুলচেরা হিসেবে নানা রঙের অংশে ভাগ করে ফেলা যায়। পরে পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষা ও তত্ত্ব দিয়ে দেখা গেছে বিভিন্ন মৌলের থেকে নির্গত আলোতে সুনির্দিষ্ট কিছু রঙের কিছু লাইন এ বর্ণালীতে পাওয়া যায় যা দেখে ঐ মৌলটি সনাক্ত করা যায়। যেমন রাস্তায় যে সোডিয়াম আলো তার বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে বেনীআসহকলা সব রঙের বদলে পাওয়া যাবে শুধু সোডিয়াম মৌলটির নির্দেশক পরস্পর খুব কাছাকাছি দুটি হলুদ লাইন– ঐ বাতিতে শুধু সোডিয়াম রয়েছে বলে। সাধারণ গ্যাসের শিখার বর্ণহীন আলোতে লবণের ছিটা দিলে তার আলোর বর্ণালীতেও ঐ দুটি লাইনই দেখা যাবে, কারণ লবণে সোডিয়াম রয়েছে। সেটি যদি জানা নাও থাকতো আমরা ঐ দুটি লাইন দেখেই বুঝতাম লবণে সোডিয়াম রয়েছে। পরে দেখা গেছে সূর্য বা অন্যান্য তারা থেকে যে আলো আসে তাতে মৌলের উপস্থিতিতে সে আলোর নির্দিষ্ট অংশ শোষিত হয়। এর ফলে বর্ণালীর ঐ রঙের বা ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘের অংশে আমরা কালো লাইন দেখতে পাই। এগুলো দেখেও আমরা সুদূর তারার মধ্যে ঐ মৌলগুলোর অবস্থান টের পাই।

বর্ণালী থেকে আমরা এখন জানতে পারছি সূর্যে যেই বস্তুগুলো আছে, অন্যান্য তারাতেও সেগুলোই আছে, এমন কি অনেক অনেক দূরের গ্যালাক্সিগুলোতেও তাই আছে। তাদের বর্ণালি সব ক্ষেত্রেই প্রায় একই ভাবে আমাদের পরিচিত। আর মজার ব্যাপার হলো আমাদের পৃথিবীতেও মোটামুটি ঐগুলোই আছে কম বেশি। তার মানে আমরা এই

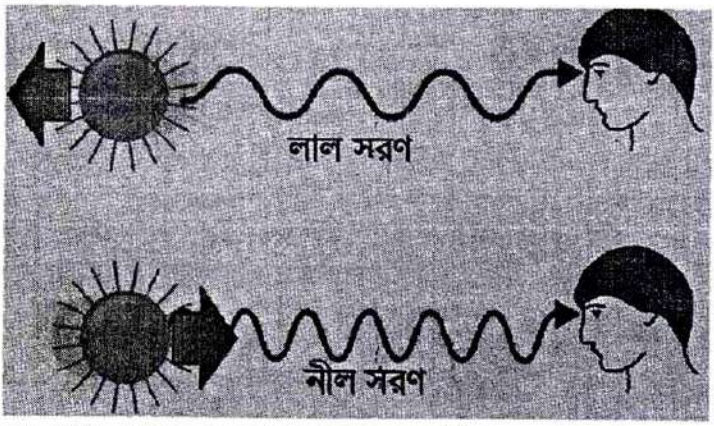

আলোর উৎস যখন দূরে সরে যাচ্ছে, আলোক তরঙ্গ দীর্ঘতর হয়ে লাল সরণ হচ্ছে। উৎস কাছে আসতে থাকলে ঘটে উল্টোটি।

বিশাল মহাবিশ্বের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা আছি।

গত শতাব্দীর প্রথম দিকে জ্যোতির্বিদরা একটি চমৎকার জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন দূরের গ্যালাক্সিগুলো থেকে আসা বর্ণালীতে। সাধারণত এর বিভিন্ন মৌলের লাইনগুলো বর্ণালীর যে যে অংশে থাকার কথা ঠিক সেখানে তাদের পাওয়া যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে তারা লাল প্রান্তের দিকে, অর্থাৎ বৃহত্তর তরঙ্গ-দৈর্ঘের দিকে সরে সরে যাচ্ছে। একে বলা যায় লাল-সরণ (রেড শিফ্ট)। যত দূরের গ্যালাক্সির বর্ণালি এই লাল-সরণের পরিমাণও তত বেশি। ডপলার-সরণ (ডপলার-শিফ্ট) নামক পদার্থ বিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব ইতোমধ্যে জানা ছিল, যার মাধ্যমে এই সরণকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো। এ সরণের মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে গ্যালাক্সিগুলো আমাদের থেকে ক্রমে প্রচন্ড বেগে দূরে সরে যাচ্ছে– যেই গ্যালাক্সি যত বেশি দূরে সেটি সরে যাচ্ছে তত অধিক বেগে। এটি শুধু আমাদের থেকে নয়, প্রত্যেক গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জ অন্যগুলোর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অর্থাৎ মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে।

লাল-সরণের সঙ্গে প্রসারিত হবার সম্পর্কটি অর্থাৎ ডপলার সরণের তত্ত্বটি বুঝা কঠিন কিছু নয়– এরকম ঘটনা আমরা অহরহ দেখছি। দৃশ্যমান ও অন্যান্য আলোর তরঙ্গের ক্ষেত্রে যেমন ডপলার সরণ ঘটে, শব্দের তরঙ্গের ক্ষেত্রেও এটি ঘটে একই ভাবে, এবং সেটি বুঝতে পারাটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সহজতর। আপনি যদি হর্ন বাজাতে বাজাতে কোন গাড়িকে অথবা সাইরেন বাজাতে বাজাতে কোন এম্বুল্যান্সকে দূর থেকে আপনার দিকে এগিয়ে আসতে শুনেন, তা হলে হর্ন বা সাইরেনের সত্যিকার শব্দের চেয়ে অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণতর শব্দ আপনি শুনতে পারবেন। এটি ভাল বুঝবেন যখন গাড়ীটি আপনাকে অতিক্রম করে দূরে চলে যেতে থাকবে। তখন লক্ষ্য করলে বুঝবেন শব্দটির তীক্ষ্ণতা হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এবার বরং স্বাভাবিকের চেয়েও মোটা শব্দ আপনি শুনতে পারেন। এই তীক্ষ্ণতা পরিবর্তনটি বেশ স্পষ্ট ধরা পড়ার কথা। আসলে যা হচ্ছিল যখন গাড়িটি এগিয়ে আসছিল তখন শব্দের তরঙ্গগুলো গতির কারণে কিছুটা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছিল এবং তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ ছোট হয়ে পড়ছিল। আর যখন গাড়ি আপনার কাছ

থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল তখন তরঙ্গ-দৈর্ঘ দীর্ঘতর হয়ে পড়ছিল উভয়ক্ষেত্রে শব্দের তীক্ষ্ণতা বা ফ্রিকোয়েন্সিকে বদলে দিয়ে। যত দ্রুত এগিয়ে আসবে বা দূরে সরবে ততই তীক্ষ্ণতার পরিবর্তন বড় হবে। তীক্ষ্ণতার পরিবর্তন মেপে আপনি বুঝতে পারবেন কী গতিতে এটি এগুচ্ছে অথবা দূরে সরছে। এটিই ডপলার সরণ। এই একই ঘটনা ঘটছে যখন গ্যালাক্সি দূরে সরে যাচ্ছে– আলো বা বিকিরণ এর ফলে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘের দিকে (লালের দিকে) সরে যায়, লাল-সরণ ঘটে। যদি দূরে সরে না গিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতো তখন লাল-সরণ না হয়ে হতো নীল-সরণ।

প্রসারণের প্রকৃতি

প্রথম যাঁরা গ্যালাক্সির লাল-সরণ আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদের পক্ষে গ্যালাক্সির দূরে সরে যাওয়ার পরিমাপ করা সহজ ছিলনা। তখনকার দূরবীক্ষণে যে দুর্বল আলো ধরা পড়তো খুব সূক্ষ্মভাবে তার বর্ণালী পরিমাপ কঠিন ছিল। তাছাড়া যেখানে বসে আমরা এটি মাপছি সেই পৃথিবীও যে গ্যালাক্সির অংশ তার নিজেরও প্রচন্ড ঘূর্ণন গতি রয়েছে যা ঐ সরে যাওয়ার পরিমাণকে কিছুটা গোলমাল করে দেবে। আমাদের গ্যালাক্সির নিজের এই ভিন্ন দিকের গতিগুলো সঠিকভাবে হিসেবের মধ্যে এনে তার জন্য শুদ্ধ করার ব্যবস্থা করে তবেই দূরের গ্যালাক্সি আরো দূরে সরে যাবার গতিটির নিঁখুতভাবে লাল-সরণ

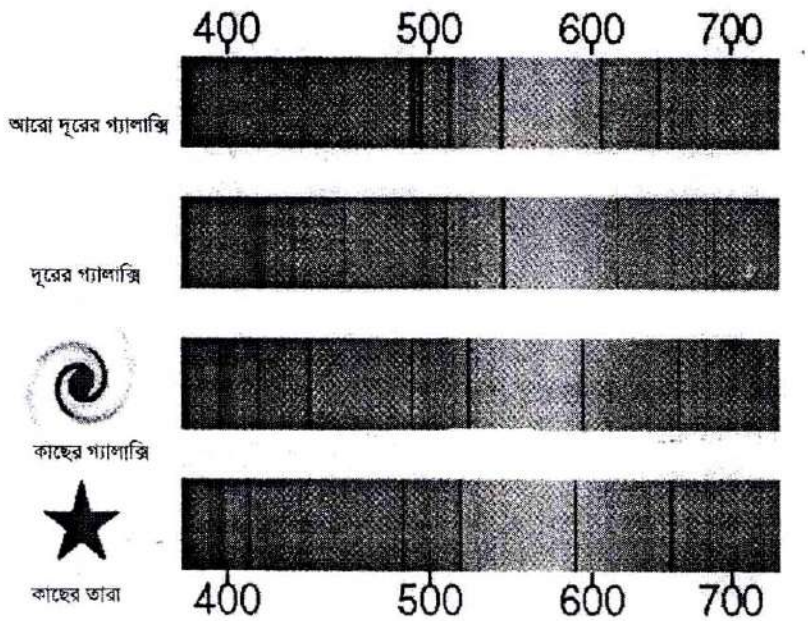

লাল সরণ যত দূরে তত বেশি

বর্ণালীর যে কোন একটি পরিচিত লাইন (যেমন একেবারে বামের ডাবল লাইন) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কাছের তারা থেকে আসা আলোর বর্ণালীতে (সর্ব নিম্নের বর্ণালী) এর যেখানে অবস্থান, দূরে গ্যালাক্সির বর্ণালীতে তা ডানে দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘের দিকে (লালের দিকে) সরে গেছে। আরো দূরের গ্যালাক্সিতে আরো বেশি সরেছে।

থেকে নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। আসলে দূরের গ্যালাক্সি যেমন সরে যাচ্ছে আমরাও কিন্তু স্থির বসে নেই। ঐ গ্যালাক্সির মত আমরাও তার থেকে সরে যাচ্ছি ঐ রকম বেগে। আসলে মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিপুঞ্জগুলো সবাই পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে একটির থেকে সরে গেলে তো উল্টো দিকে আর একটির তুলনামূলক কাছে চলে যাওয়ার কথা, সেটি যদি একই রকম বেগে নিজেও সরতে থাকে তাও। কিন্তু এমনটি হচ্ছেনা, কেউ কারো কাছে যাচ্ছেনা, বরং সবাই সবার থেকে দূরে যাচ্ছে। যে যার থেকে যত বেশি দূরে তার থেকে তার সরার গতিও তত বেশি। এমন ঘটনা ঘটতে পারে একমাত্র তখনই যখন এই সব গ্যালাক্সি আছে যেই 'স্থানে' বা 'স্পেসে'– সেই স্থানটিই ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের সামগ্রিক স্থানটিই ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে। একটি বেলুনের উপমা নিলে ব্যাপারটি ভাল বুঝা যাবে।

মনে করুন ফুলাবার আগে একটি বেলুনের সারা গায়ে নানা স্থানে ইতস্তত কয়েকটি ধূলিকণা আঠা দিয়ে সেটে দেয়া হলো। এখন বেলুনটি ফুলাতে থাকলে ধূলিকণাগুলো ক্রমে একটি অন্যটির থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। এদের প্রত্যেকটি প্রত্যেকের থেকে দূরে সরবে, কোনটি অন্য কোনটির কাছে যাবেনা। বেলুন নিজে প্রসারিত হচ্ছে বলেই এমনটি হচ্ছে। আরো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কোন একটি ধূলিকণার থেকে অপেক্ষাকৃত দূরের ধূলিকণাটির সরার গতিও বেশি হচ্ছে। এখানে বেলুনটি মহাবিশ্বের সামগ্রিক স্থানের সঙ্গে তুলনীয় আর ধূলিকণাগুলো তুলনীয় হলো গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জের সঙ্গে। ধূলিকণা নিজে কিন্তু বড় হচ্ছেনা কারণ তার নানা অংশের মধ্যে দূরত্ব কম বলে প্রবলতর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে তারা পরস্পরের সঙ্গে শক্ত ভাবে সেঁটে রয়েছে। একই ভাবে গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জের মধ্যে যে নানা গ্যালাক্সিপুঞ্জ রয়েছে তাদের মধ্যকার দূরত্ব কিন্তু বদলাবেনা অধিকতর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে।

গ্যালাক্সিপুঞ্জের মধ্যে যে গ্যালাক্সিগুলো রয়েছে, বা গ্যালাক্সির মধ্যে যে তারাগুলো রয়েছে, কিংবা তারার সঙ্গে যে গ্রহগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে দূরত্ব পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠবেনা একই কারণে। সেখানে নৈকট্য আরো বেশি, মাধ্যাকর্ষণ আরো প্রবল। কাজেই মহাবিশ্ব যে প্রসারিত হচ্ছে এতে পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাওয়াটি কিন্তু ঘটছে বিশালকায় গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জের পর্যায়ে গিয়ে।

হাবলের নিয়ম

যত দূরের কোন মহাপুঞ্জের গ্যালাক্সির আলোর বর্ণালী আমরা দেখি এবং একটি বিশেষ লাইনকে লক্ষ্য করি, দেখতে পাই বর্ণালীতে তার অবস্থান লালের দিকে তত বেশি সরে গেছে। এই লাল সরণ থেকে ডপলার তত্ত্ব অনুযায়ী ঐ গ্যালাক্সির দূরে সরার বেগও নির্ণয় করে ফেলা যায়। সঙ্গের চিত্রে এরকম বিভিন্ন দূরত্বের গ্যালাক্সির বর্ণালী একের নিচে এক রাখা হয়েছে যার লাইনগুলো সবই যে এক তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে– পর পর বর্ণালীগুলোতে এগুলো ক্রমে বেশি বেশি ডান দিকে অর্থাৎ লালের দিকে সরে গেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তীর দিয়ে দেখানো বিশেষ লাইনটির ডানে সরার পরিমাণ দেখে সরার পরিমাণটি আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি– সেই সঙ্গে এর থেকে নির্ণয় করা বেগটিও সঙ্গে

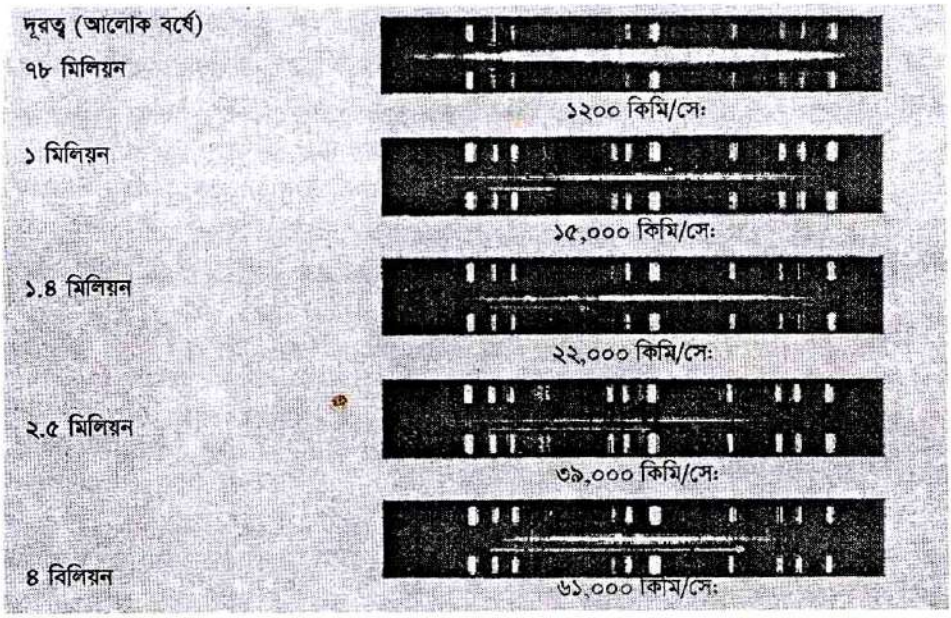

বিভিন্ন দূরত্বে পাঁচটি গ্যালাক্সির জন্য রেড শিফ্‌ট থেকে গতিবেগ। প্রত্যেক ক্ষেত্রে গ্যালাক্সির বর্ণালী দুটি ষ্ট্যান্ডার্ড বর্ণালীর মাঝখানে। উপরের ছবিতে নিচের অভিমুখে তীর যে লাইন নির্দেশ করছে নিচের ছবিগুলোতে তা ক্রমে ডানে সরে যাচ্ছে (ডান অভিমুখে তীর দেখুন)।

দেয়া হয়েছে। এ ভাবে ৭.৮ কোটি আলোক-বর্ষ দূরের গ্যালাক্সি সরছে সেকেন্ড ১২০০ কিলোমিটার বেগে, ১০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূরেরটি সরছে অনেক বেশি বেগে সেকেন্ডে ১৫০০০ কিলোমিটার বেগে। এভাবে যত দূরে তত বেশি বেগে–৪০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূরেরটি সেকেন্ডে ৬১০০০ কিলোমিটার বেগে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দূরত্বের সঙ্গে বেগের সম্পর্কটি মোটামুটি সুন্দর ভাবে সমানুপাতিক–অর্থাৎ দূরত্ব যখন দ্বিগুণ হচ্ছে বেগও দ্বিগুণ হচ্ছে, যখন ৮গুণ হচ্ছে, বেগও তাই হচ্ছে। দূরত্বের সঙ্গে এভাবে বেড়ে মহাবিশ্বের সুদূরতম অঞ্চলের অর্থাৎ কিনারার গ্যালাক্সিগুলোর বেগ হয়েছে প্রচন্ড। সেখানে প্রায় এক হাজার কোটি আলোক-বর্ষ দূরের সেই কোয়াজারগুলো আমাদের থেকে ছুটে চলেছে আলোর গতির দুই তৃতীয়াংশ গতিতে–যা অভাবনীয় রকমের দ্রুত– কারণ আলোর গতি হচ্ছে কোন জিনিসের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতি। অপেক্ষাকৃত কম দূরত্ব থেকে মহাবিশ্বের কিনারার দূরত্ব পর্যন্ত এক একটি গ্যালাক্সির দূরত্ব-অক্ষে এবং বেগ–অক্ষে দিয়ে প্রত্যেকটির জন্য একটি বিন্দু গ্রাফে স্থাপন করলে সামান্য ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও এ বিন্দুগুলো সুন্দর একটি সরল রেখা তৈরি করে ফেলে–এখানে দেয়া চিত্রের মত। দূরত্ব ও বেগের নির্ণয়ে কিছুটা ভুলচুক হয়ে থাকে বলেই হুবহু এক রেখায় না পড়লেও, সরল রেখাটি বেশ স্পষ্ট, এবং দূরত্ব এবং বেগ যে আগাগোড়া সব ক্ষেত্রেই সমানুপাতিক তাও বেশ স্পষ্ট।

এখন মহাবিশ্ব সম্পর্কে যে পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কার চলছে তাতে খুব বড় অবদান রাখছে পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তনশীল মহাশূন্যে স্থাপিত হাবল স্পেস টেলিস্কোপ। যাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য এর নামকরণ সেই মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল মহাবিশ্ব

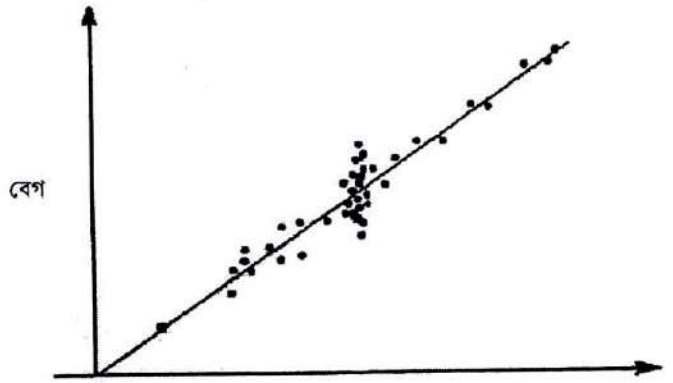

হাবলের নিয়ম

সম্পর্কে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। ১৯২০ এর দশকে মাউন্ট উইলসন দূরবীক্ষণে তাঁর নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও উদ্ঘাটনগুলার মাধ্যমে আমরা অতি দূরবর্তী গ্যালাক্সিসমূহ, তাদের দূরত্ব ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে প্রায় বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসতে পেরেছি। এই হাবলই মহাবিশ্বের প্রসারণকে গ্যালাক্সি সমূহের দূরত্ব ও বেগের মাপজোকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। দূরত্ব ও বেগের সমানুপাতিক হওয়ার নিয়মটিকে তাই বলা হয় হাবলের নিয়ম। নিয়মটি হলো:

বেগ=H ×দূরত্ব

বেগও দূরত্ব সমানুপাতিক বলেই সমানুপাতিকতার ধ্রুবক হিসাবে H সংখ্যাটি এসেছে, যা ঐ সরল রেখাটির ঢাল (স্লোপ) নির্দেশ করে। H-কে বলা হয় হাবলের ধ্রুবক। দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করলে আমরা বেগ পাই। তাই হাবলের নিয়ম অনুযায়ী সময় হবে 1/H। অর্থাৎ এই প্রসারণ কত সময় ধরে ঘটেছে তা আমরা পেয়ে যাই যদি হাবলের ধ্রুবকটি জেনে ফেলতে পারি। আর এই ধ্রুবক তো গ্রাফে আঁকা আমাদের সেই সরল রেখা থেকেই, তার ঢাল থেকেই পেয়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ মহাবিশ্বের বয়স জানতে হলে নিখুঁতভাবে হাবলের ধ্রুবকটিই শুধু জানতে হবে।

অতীতে গিয়ে বিন্দু, সেখান থেকে বয়স

গ্যালাক্সিগুলো প্রসারণের যে প্রকৃতি আমরা দেখেছি, একে যেভাবে স্থানের প্রসারণ রূপে পেয়েছি, তাতে বলতে পারি এখন সেগুলো পরস্পরের থেকে যে রকম দূরত্বে আছে কিছু অতীতে তার চেয়ে সবাই সবার অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি ছিল, আরো অতীতে আরো কাছাকাছি ছিল। উপমা হিসাবে যে ফুলানো বেলুনের কথা বলেছি সেটিকে যদি আবার ধীরে ধীরে চুপসে যেতে দিই তা হলে দেখবো এর গায়ে ইতস্তত আটকানো ধূলিকণাগুলো ক্রমে পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসছে। এখন প্রশ্ন হলো এ ভাবে অতীতের দিকে যেতে যেতে মহাবিশ্বের বস্তুপুঞ্জ কাছাকাছি আসতে আসতে একেবারে আদি সময়ে শেষ পর্যন্ত গিয়ে আমরা তাদেরকে কী ভাবে পাব? স্পষ্টত সবকিছু একটি

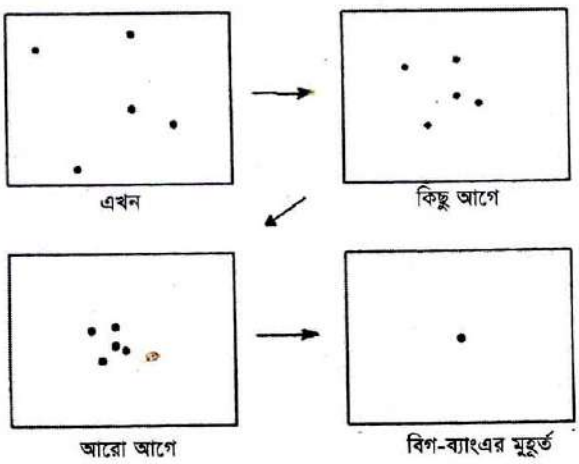

বিন্দুতে পর্যবেশিত হবে, যেমনটি আমরা হাবল নিয়মের সেই সরল রেখাকেও দূরত্ব কমতে কমতে শূন্যতে গিয়ে পৌঁছতে দেখেছি।

এর সঙ্গে বিগ্ ব্যাং তত্ত্বকে মিলিয়ে নিলে আমরা এই বিন্দুবৎ অবস্থায় থাকা মুহূর্তকেই মহাবিশ্বের শুরুর বিন্দু হিসেবে নিতে পারি। সেই অত্যন্ত ঘন পুঞ্জীভূত আদি বিন্দু থেকে মহাবিষ্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের প্রসারণ শুরু হয়েছিল। সেখান থেকেই এর বয়সের শুরু। ঐ আদি বিন্দু অবস্থা থেকে আজকের অবস্থায় আসতে কত সময় পার হয়েছে সেটিই মহাবিশ্বের বয়স। আর এ সময়টা নির্ণয়ের চমৎকার উপায় আমরা একটু আগে দেখলাম। নানা দূরত্বের গ্যালাক্সির দূরত্ব ও বেগ জেনে তাদেরকে হাবলের নিয়মের সরল রেখায় এনে, সেই রেখার ঢালটি অর্থাৎ H বের করে এটি পাওয়া যায়। H এর উল্টোটা অর্থাৎ 1/H হলো সেই বয়স। সুদূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলো সম্পর্কে তথ্যগুলো জানার পর এবং হাবলের নিয়ম আবিষ্কারের পর এই বয়স আমরা পেয়ে গেলাম। কিন্তু বয়স হিসেবে প্রথমে যা পেলাম সেটি গ্রহণ করা সম্ভব হলোনা। তখনকার তথ্য অনুযায়ী এর থেকে মহাবিশ্বের বয়স দাঁড়ালো ২০০ কোটি বছর। কিন্তু ইতোমধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয়ের পরিমাপ থেকে আমরা প্রায় নিখুঁত ভাবেই আমাদের পৃথিবীর বয়স পেয়ে গিয়েছিলাম– সেটি হলো ৪৫০ কোটি বছর। মহাবিশ্বের সৃষ্টির বহু পর সৃষ্ট তার একটি গ্যালাক্সিতে একটি তারা সূর্যের একটি গ্রহের বয়স মহাবিশ্বের বয়সের চেয়ে বেশি হতে পারেনা, কারণ সেটি হবে নাতির বয়স দাদুর বয়সের চেয়ে বেশি হবার মত!

তা হলে প্রসারণের পুরো তত্ত্বটি, কিংবা হাবলের নিয়ম কি ভুল? কিন্তু তা হয় কী করে, এগুলো যে স্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন যে সব তথ্যের ভিত্তিতে হাবল নিয়মের সেই সরল রেখাটি তৈরি হয়েছে সেসবের নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। এতে দু'রকমের পরিমাপ জড়িত– গ্যালাক্সি সমূহের দূরত্বের এবং এদের বেগের। বেগ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারেনা কারণ তা বর্ণালীর লাইনের নিখুঁত পরিমাপের মাধ্যমে ডপলার সরণ তত্ত্বের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দূরত্ব সম্পর্কে এ কথা বলা যায়না, কারণ এক্ষেত্রে বেশ কিছু আন্দাজ ও ধরে নেয়ার ব্যাপার জড়িত রয়েছে। সন্দেহ করা হলো সুদূরতম

তারাগুলোর দূরত্ব মাপতে কোথাও হয়তো বেশ বড় রকমের ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু ভুলগুলো কী? দেখা গেল সেফেইড তারার ঔজ্জ্বল্য বাড়া কমার পর্যায়কালকে যে ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তারার দূরত্ব মাপতে তাতে কিছু বড় ভুল থেকে গেছে। এ সময় আবিস্কৃত হলো সেখানে দুই প্রকৃতির তারা রয়েছে তাদেরকে এই দুই গোষ্ঠিতে ভাগ করে ফেলা গেল। একটি গোষ্ঠির তারা অপেক্ষাকৃত তরুণ, অন্যটির অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। একটি গোষ্ঠির সেফেইড নক্ষত্রের জন্য ঔজ্জ্বল্য ও পর্যায়কালের সম্পর্ক লীভিটের গ্রাফের সঙ্গে মিল্‌লেও অন্য গোষ্ঠির জন্য তৈরি করতে হয় ভিন্ন রকম গ্রাফ। এই দিকটি শুদ্ধ করে নেয়াতে দূরত্বের কিছু ত্রুটি দূর হলো, কিন্তু সব দূর হলোনা। শিগ্‌গির উদ্ঘাটিত হলো যে জানা দূরত্বের গ্যালাক্সির উজ্জ্বলতম তারাকে ষ্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেল হিসেবে ব্যবহার করে, এবং সব গ্যালাক্সির উজ্জ্বলতম তারার প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য একই ধরে নিয়ে, যে সব গ্যালাক্সির দূরত্ব নির্ণয় করা হয়েছে, সেখানেও ভুল রয়েছে। দেখা গেল কোন কোন গ্যালাক্সিতে যাকে উজ্জ্বলতম তারা মনে করা হয়েছে সেটি আসলে তারাই নয়, অতি উত্তপ্ত ও অতি উজ্জ্বল হাইড্রোজেন গ্যাসকে তারা মনে করা হয়েছে। তারাগুলোর থেকে শক্তি ধার করে এই গ্যাস অস্বাভাবিক রকম বেশি ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে। আসলে যেটি উজ্জ্বলতম তারা, তার ঔজ্জ্বল্য এর চেয়ে অনেক কম। একেই যদি ষ্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেলের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাতে তার দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্যের এই কম হওয়াটাই বলে দেয় যে এটি আসলে অনেক বেশি দূরে অবস্থিত, আগে যে দূরত্বে মনে করা হয়েছিল সেখানে নয়। এভাবে অনেক তারার দূরত্ব আবার নূতন করে নিখুঁত করে নিতে হলো। তাদের দূরত্ব অনেক খানি বেশি বলে প্রমাণিত হলো।

নূতন দূরত্বগুলোকে হাবলের নিয়মে এনে পাওয়া গেল সম্পূর্ণ নূতন একটি সরল রেখা যার হাবলের ধ্রুবকের (H) মান একেবারেই ভিন্ন। এর থেকে যে বয়স (1/H) পাওয়া গেল সেটি আগের থেকে অনেক বেশি। আরো পরে আবিস্কৃত হয়েছে যে ভাবে মনে করা হয়েছিল মহাবিশ্বের প্রসারণের গতিও সব কালে সমান ছিলনা। এ গতি ক্রমেই বেড়েছে। মহাবিশ্বের এই ত্বরিত গতির জন্যও বয়সের ক্ষেত্রে কিছুটা সংশোধন করতে হয়েছে। সবকিছু হিসেবে এনে, সবদিক থেকে নিঁখুত করে তুলে, মহাবিশ্বের যে বয়স এখন মোটামুটি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত তা হলো চৌদ্দ শত কোটি বছর।

সৃষ্টির প্রথম উৎসব

বিগ্ ব্যাং এ বিশ্বসৃষ্টি

যাবতীয় গ্যালাক্সিগুলো থেকে আসা আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তাদের সবগুলোতে বস্তু যা রয়েছে তার প্রায় সবটুকুই হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। বাকি যে বস্তু তা খুবই নগণ্য পরিমাণে। মহাবিশ্বের বস্তুপুঞ্জের শতকরা ৭৫ ভাগই হাইড্রোজেন এবং ২৫ ভাগের খুব কাছাকাছি হিলিয়াম। হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের এই অনুপাত কেমন করে তৈরি হলো?

উচ্চ শক্তি পদার্থবিদ্যার অতি আধুনিক গবেষণার জন্য অত্যন্ত ব্যয়- বহুল যে কণিকা ত্বরক যন্ত্র (পার্টিকল একসেলারেটর) রয়েছে তাতে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকা নিউট্রন পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা যায়– ঠিক যেমন করে বিগ্ ব্যাং এর সময়ে অকল্পনীয় রকম উত্তপ্ত অবস্থায় ঘটার কথা। বর্তমানের এই পরীক্ষণে দেখা গেছে ঐ অবস্থায় প্রোটন আর নিউট্রনের যে অনুপাত হয় তাতে ভরের হিসাবে শতকরা ৭৫ ভাগ হাইড্রোজেন ও ২৫ ভাগ হিলিয়ামই হবার কথা। যদিও মহাবিশ্বে পরে অন্য প্রক্রিয়ায় আরো কিছু হিলিয়াম হাইড্রোজেন থেকে তৈরি হয়েছে, মোট বস্তুর তুলনায় তা খুবই কম। এভাবে বিগ্ ব্যাং তত্ত্ব মহাবিশ্বের হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের অনুপাতের মত সূক্ষ্ম বিষয়কে ব্যাখ্যা করে দিতে সক্ষম হয়েছে। এর বিস্তারিত প্রক্রিয়াটি আমরা কিছু পরে দেখবো। পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যকে এভাবে ব্যাখ্যা করার এই ক্ষমতাটি বিগ্ ব্যাং তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে আর একটি বড় প্রমাণ হিসাবে কাজ করেছে।

বিগ্ ব্যাং কালীন পটভূমি বিকিরণ CMB-তে আমাদের আজও ডুবে থাকা, হাবলের নিয়ম অনুযায়ী মহাবিশ্বের প্রসারিত হওয়া, এবং মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের অনুপাতকে ব্যাখ্যা করতে পারা– এ তিনটি সাক্ষ্য বিগ্ ব্যাং তত্ত্বকে অকাট্য প্রমাণের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এ তত্ত্ব বলছে এখন থেকে চৌদ্দ শত কোটি বছর আগে একটি মুহূর্তে হঠাৎ একটি বিন্দু সদৃশ হয়ে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল। আর সেই অকল্পনীয় ঘন অকল্পনীয় উত্তপ্ত বিন্দুটি সেই মুহূর্ত থেকে নিজের স্থানকে প্রসারিত করে আজকের অভাবনীয় রকমের বিশাল স্থানে পরিণত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সকল বস্তু আর সকল শক্তি। এই দীর্ঘ চৌদ্দ শত কোটি বছরের ইতিহাসকে আমরা সংক্ষেপে পরিভ্রমণ করতে চাই এই বইয়ের মধ্যে। কিন্তু তার থেকে আপাতত প্রথম দশ মিলিসেকেন্ড সময় বাদ দিয়ে রাখতে চাই। এর কারণ এই প্রথম দশ মিলিসেকেন্ডে–

বিশেষ করে তার শুরুর দিকের অতি ক্ষুদ্র সময়ে যা ঘটেছে সেটি ব্যাখ্যা করতে হলে আজকের পদার্থবিদ্যার সুপ্রমাণিত তত্ত্বগুলোর সীমা ছাড়িয়ে নূতন এখনো অনিশ্চিত তত্ত্বে যেতে হবে– সে সময়ের ছোট্ট মহাবিশ্বের ঘনত্ব ও উত্তাপ এতই বেশি ছিল। ফলে ঐ সময়টার বর্ণনা আমাদের জন্য এখনো প্রধানত তত্ত্ব-নির্ভর হয়ে রয়েছে। সেখানে একাধিক যথেষ্ট যৌক্তিক তত্ত্ব চালু রয়েছে, যার কোনটিই এখনো পরীক্ষণের দ্বারা সুপ্রমাণিত নয়। এই ক্ষণিক কালটুকুর আলোচনা আমরা বইয়ের শেষের দিকে আলাদাভাবে করবো, তুলনামূলক ভাবে কম সুপ্রতিষ্ঠিত আরো কিছু বিষয়ের সঙ্গে। ঐ বিন্দুবৎ মহাবিশ্ব কিসের থেকে সৃষ্টি হলো, এর আগে কিছু কি ছিলনা, এর বাইরে কি কিছু ছিলনা, এরকম অতি সঙ্গত অথচ অতি জটিল বেশকিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা আমরা সেই আলোচনা পর্যন্ত স্থগিত রেখে আপাতত বাকি ইতিহাস নিয়ে এগিয়ে যাই।

আরো একটি কারণে সৃষ্টির ঐ প্রথম মুহূর্তগুলোর আলোচনা কঠিন। দশ মিলিসেকেন্ড পর থেকে সে ইতিহাস আমরা উদ্ঘাটন করেছি, তা করতে পেরেছি আজকের নিখুঁত তথ্যের ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে পেছনের দিকে গিয়ে। তাই সেখান পর্যন্ত আমরা শক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রয়েছি। কিন্তু পেছনে গিয়ে ঐ একেবারে প্রথম মুহূর্তে পৌঁছার আগেই এমন কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হবে যেখানে আজকের তথ্যগুলোর থেকে পেছনে যাওয়ার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছে। সেখানে তাই আমাদেরকে এখনো শুধু তত্ত্বের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ধারাবাহিকতায় ছেদ কীভাবে পড়ল তাও আমরা পরের সেই আলোচনায় দেখব।

দশ মিলিসেকেন্ডের পর

বিগ্ ব্যাং এর দশ মিলিসেকেন্ড পর মহাবিশ্ব বিন্দুবৎ অবস্থা থেকে অনেকখানি বড় হয়েছে–কিন্তু এর উত্তাপ এখনো প্রচন্ড– প্রায় ১ লক্ষ কোটি ডিগ্রি। বর্তমান মহাবিশ্বের যে গড় উত্তাপ সেই ৩ ডিগ্রি কেলভিন (- ২৭০° সেলসিয়াস) থেকে যৌক্তিকভাবে পেছনে গিয়ে আমরা সেটি জানতে পারছি। মহাবিশ্ব যত প্রসারিত হয়েছে তার উত্তাপ তত কমতে কমতে আজ এই অবস্থায় এসেছে। দশ মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত মহাবিশ্বে ছিল শুধু শক্তি কণিকা ফোটন। সেখানে তখন শুধু শক্তির দাপট। কিন্তু পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী তখন এক একটি ফোটন থেকে একটি বস্তু কণিকাও একই সঙ্গে তার একটি প্রতিকণিকা তৈরি হতে লাগলো। এভাবে সৃষ্টি হতে শুরু হলো ইলেকট্রন এবং তার প্রতিকণিকা পজিট্রন, প্রোটন ও তার প্রতিকণিকা এন্টিপ্রোটন, নিউট্রন ও এন্টিনিউট্রন। একে বলা হয় জোড়-সৃষ্টি। এই কণিকা আর প্রতিকণিকা একত্র হলে অবশ্য বস্তু বিলুপ্ত হয়ে আবার ফোটনে পরিণত হয়। ঐ রকম উচ্চ উত্তাপে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এরকম বিলুপ্তি খুবই বেশি হচ্ছিল। বস্তুর তাই স্থায়িত্ব ছিল কম। এক সেকেন্ড বয়সে এসে উত্তাপ নেমে দাঁড়ালো এক হাজার কোটি ডিগ্রিতে। এসব অত্যন্ত উচ্চ উত্তাপের ক্ষেত্রে কেলভিন আর সেলসিয়াস স্কেলের ২৭৩ ডিগ্রি ব্যবধানে কিছু আসে যায়না। তাই এরকম ক্ষেত্রে আমরা স্কেলের উল্লেখ আর করবনা।

পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী নিউট্রন অবক্ষয়িত হয়ে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনে পরিণত হতে পারে। যদিও শুরুতে প্রোটন ও নিউট্রন সমান সমান ছিল কিছু কিছু

নিউট্রন অবক্ষয়িত হয়ে প্রোটনে পরিণত হতে থাকলে নিউট্রনের তুলনায় প্রোটনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দেড় মিনিট বয়সে এসে উত্তাপ ইতোমধ্যে কমে একশ' কোটি ডিগ্রিতে এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তাপ কমে যাওয়াতে বস্তু কণিকা আর তার প্রতি-কণিকা একত্র হয়ে আবার শক্তিতে পরিণত হবার হার কমলো, বস্তুর কিছুটা স্থায়িত্ব আসলো। প্রোটন এভাবে স্থায়ী হয়ে গেলেও নিউট্রন কিন্তু ক্রমেই প্রোটনে ও ইলেকট্রনে অবক্ষয়িত হয়ে কমে যেতে থাকলো। দশ হাজার কোটি ডিগ্রি উত্তাপে নিউট্রন-প্রোটনের অনুপাত ছিল শতকরা ৫০/৫০, এক হাজার কোটি ডিগ্রিতে শতকরা ২৪টি নিউট্রনের জন্য ৭৬টি প্রোটন, এবং একশত কোটি ডিগ্রিতে ১২টি নিউট্রনের জন্য ৮৮টি প্রোটন। এরপর নিউট্রনের অনুপাত আর কমতে পারেনি, কারণ এরপর উত্তাপ এমন পর্যায়ে কমে গেছে যাতে প্রত্যেকটি নিউট্রন একটি প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়াস গঠন করে। এরকম উত্তাপে নিউট্রন আর পৃথক নিউট্রন হিসাবে থাকতে পারেনা, এবং পৃথক না থাকতে পারলে তার অবক্ষয়ও ঘটতে পারেনা। মনে রাখতে হবে প্রোটন হচ্ছে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস, এবং একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনের সমন্বিত রূপ হলো ভারী হাইড্রোজেন অর্থাৎ ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়াস। পরে দুটি ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াস একত্র হয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। কাজেই এ সময় নিউট্রনের পরিমাণ স্থায়ী ভাবে ঠিক করে দিয়েছে হিলিয়ামের পরিমাণকে। এভাবে বিগ্ ব্যাং-এর দেড় মিনিট পর হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসের ভরের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৭৬/২৪, এবং সেখানেই এটি স্থায়ী হয়ে গেছে। এর কারণ প্রোটন আর নিউট্রনের এই অনুপাতই তখন স্থিতি লাভ করেছে। এর ফলেই আজো যখন আমরা গ্যালাক্সির আলোর বর্ণালী থেকে মহাবিশ্বের সর্বত্র হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের অনুপাত মোটামুটি এরকমই দেখি, তখন বিগ্ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী এই ব্যাখ্যারই বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করি। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ছাড়াও খুবই সামান্য পরিমাণে লিথিয়াম ও ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াসও এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়, তাও এখন বাস্তব পরীক্ষণে প্রমাণিত। যেমন এই সামান্য ডিউটেরিয়ামের স্থানীয় সূক্ষ্ম প্রাচুর্য থেকে আমরা এখন মহাবিশ্বের নানা ফাঁকা অঞ্চলের বস্তু-ঘনত্ব পরিমাপ করতে পারি। কিন্তু এই ক'টি খুব হালকা মৌলের নিউক্লিয়াস ছাড়া অধিকতর সংখ্যায় প্রোটন নিউট্রন একত্র হয়ে এর চেয়ে ভারী কোন মৌল এই প্রক্রিয়ায় সম্ভব হয়নি। কারণ তখন যে উত্তাপ ছিল, আর ঘনত্ব যে পর্যায়ে নেমে এসেছে, তাতে এটি আর সম্ভব ছিলনা।

মনে রাখতে হবে তখনো কিন্তু উত্তাপ প্রচন্ড , তাই বস্তুর পরমাণু গঠন তখনো সম্ভব হয়নি। যা ছিল তা হলো শুধু পরমাণুর কেন্দ্র নিউক্লিয়াসে গড়া উত্তপ্ত গ্যাস, যাকে বলা হয় প্লাজমা। একটি প্রশ্ন উঠতে পারে শুরুতে কণিকা আর তার প্রতিকণিকা সমান সমান হয়ে সৃষ্টি হলেও আজকের বিশ্বে আমরা কণিকায় গড়া বস্তুরাজিই দেখছি, প্রতিকণিকায় গড়া প্রতিবস্তু দেখছিনা। যদি উভয়ে থাকতো তা হলে স্থায়ী বস্তুরাজি সৃষ্টিই হতে পারতোনা, কারণ এক সময় কণিকা ও প্রতিকণিকা মিলে সবই বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভাল যে শুরুতেই বিশেষ ধরণের কিছু কণিকার অবক্ষয়ে কণিকা ও প্রতিকণিকার মধ্যে খুব সামান্য একটি অপ্রতিসাম্য সৃষ্টি হয়, যাতে একশত কোটি কণিকা- প্রতিকণিকার মধ্যে একটি কণিকা বাড়তি থেকে যায়। অন্য সব কণিকা-প্রতিকণিকা সম্মিলনে এগুলোর বিলুপ্তির পর ঐ বাড়তি কণিকাগুলোই থেকে গেছে

আজকের সব বস্তু গঠনের জন্য। এরপর উত্তাপও এমন পর্যায়ে নেমে গেছে যে নূতন করে আর কণিকা-প্রতিকণিকার জোড়া সৃষ্টি সম্ভব হয়নি, মহাবিশ্বে তাই প্রতিবস্তুর স্থানও হয়নি। বিগ্ ব্যাং পরবর্তী আরো অনেক ঘটনার মত ঐ সামান্য অপ্রতিসাম্য সৃষ্টির ঘটনাটিও একটি দৈবাৎ ঘটনা যার ফলে আজকের বস্তু জগত সম্ভব হয়েছে। ঠিক আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু জগত সৃষ্টির দৈবাৎ ঘটনাকে অনেকে মনে করতে পারেন আমাদের প্রতি বিশ্ব-ইতিহাসের একটি পক্ষপাতিত্ব–এও যেন এক ধরনের 'মানব-মুখিতা'। এরকম আপাত মানবমুখিতার আরো বহু উদাহরণ আমরা মহাবিশ্বের ইতিহাসে পদে পদে দেখবো।

স্বচ্ছ বিশ্ব, মুক্ত শক্তি

মহাবিশ্বের কোটি কোটি ডিগ্রি উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বস্তুরাজি ঐ হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের প্লাজমা অবস্থায় ছিল দীর্ঘকাল, যতদিন পর্যন্ত না উত্তাপ অনেক অনেক কমে এসেছে। অবশেষে এটি এমন কম উত্তাপে নেমে এলো যে রকম উত্তাপ আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেই কোথাও কোথাও রয়েছে। এটি হতে সময় লাগলো বিগ্ ব্যাং এর পর প্রায় ১০ লক্ষ বছর। এই পর্যায়ে এসে উত্তাপ নেমে এলো মাত্র ৪ হাজার ডিগ্রিতে। সূর্যের বাইরের দিকে যে গ্যাস এখন রয়েছে তারও উত্তাপ এরকম ৪ হাজার ডিগ্রি, কাজেই এটি আমাদের আজকের পরিচিত মামুলি উত্তাপের মতই। এটি এমন উত্তাপ যাতে প্রোটন বা নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ইলেকট্রন গিয়ে যোগ দিতে পারে তার চারিদিকে পরিক্রমণ করার জন্য– নিউক্লিয়াসের পজিটিভ চার্জের সঙ্গে ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জের আকর্ষণের ফলে। এভাবে এই প্রথম গঠিত হলো পূর্ণাঙ্গ পরমাণুর হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম প্লাজমা এবার সাধারণ গ্যাসে পরিণত হলো। উচ্চ উত্তাপের ফলে পরমাণু যতদিন তৈরি হতে পারেনি ততদিন মহাবিশ্বের শক্তি সারাক্ষণ ঐ প্লাজমা বস্তুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিল, তার সঙ্গেই জড়িত ছিল। মুক্ত ভাবে বিচরণশীল ইলেকট্রন থেকে আলোরূপী শক্তি ঠিকরিয়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত। আলো এভাবে বিক্ষিপ্ত হবার কারণে ঐ প্লাজমা ছিল অস্বচ্ছ একটি জিনিস, যার ভেতর দিয়ে আলো অবাধে চলে যেতে পারে না। প্লাজমা থেকে পরমাণু যখন গঠিত হয়ে গেল ওখানে শক্তির কাজ শেষ হয়ে গেল, শক্তি মুক্তি পেল বস্তুর নিগড় থেকে– উন্মুক্ত মহাবিশ্বে। ইলেকট্রনগুলো যখন পরমাণুতে আটকা পড়লো আলোকে ঠিকরিয়ে দেবার সুযোগও সেগুলোর থাকলো না। কাজেই শক্তি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাবিশ্বও স্বচ্ছ হয়ে পড়লো। তখন যদি দেখার মত কেউ থাকতো তা হলে পুরো মহাবিশ্বেই এই আলো দেখা যেত। এতদিন বস্তু আর শক্তি জড়াজড়ি করে ছিল বলে উভয়ের উত্তাপ ছিল একই–ইলেকট্রন আর ফোটন তাদের সংঘর্ষের মাধ্যমে তাপকে উভয়ের মধ্যে সারাক্ষণ ভাগ করে নিচ্ছিল। এখন বস্তুকে ছেড়ে শক্তি বিকিরণ রূপে মুক্তি লাভ করে মহাবিশ্বকে পরিব্যক্ত করলো, এবং নিজের মতো করে নিজে ক্রমে শীতল হতে লাগলো মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে। এই প্রক্রিয়ায় এটি ক্রমে আলো থেকে দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘের বিকিরণে বদলে যেতে যেতে আজ মাইক্রোওয়েভে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে এটি ক্রমে শীতল হতে হতে আজ মাত্র ৩ ডিগ্রিতে (কেলভিন) নেমে এসেছে–যাকে আমরা মহাবিশ্বের গড় উত্তাপ বলতে পারি। এই মাইক্রোওয়েভ পটভূমিই আজ

আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে (CMB), এবং বিগ্ ব্যাং তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কাজেই প্রায় দশ লক্ষ বছর বয়সী মহাবিশ্বের সেই ঘটনাগুলোকে তার ইতিহাসে একটি মাইল ফলক বলা যায়। তখন পরমাণু গঠিত হয়েছে, মহাবিশ্ব স্বচ্ছ হয়েছে, আর শক্তি মুক্ত হয়ে আজকের মহাবিশ্বে CMB হিসেবে সেদিনের সাক্ষ্য দিতে আসার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে। আর CMB'র নিদর্শন আমাদের সম্প্রচারবিহীন টেলিভিশন পর্দায় ঝির ঝির আলোর মধ্যে যখনই দেখি তখনই সেই মাইল ফলকের ঘটনাটিই আমরা যেন দেখতে পাই– সে ঘটনার প্রায় চৌদ্দ শত কোটি বছর পর! বলা যায় এই মাইল ফলকের মধ্য দিয়ে বিগ্ ব্যাং এর প্রক্রিয়াটি শেষ হলো। এতদিন মহাবিশ্বে ছিল মোটামুটি শক্তির প্রাধান্য। এখন থেকে শুরু হলো বলতে গেলে বস্তুর রাজত্ব–যেই বস্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের গ্যালাক্সি, সূর্য এবং পৃথিবীকে নিয়ে এসেছে, যেখানে আমরা আসতে পেরেছি। বস্তু ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে এই সব চমৎকার রূপ নিতে পেরেছে। বস্তু স্থানের সঙ্গে ব্যাপ্ত নয় বলে স্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রসারণের ও সেকারণে শীতল হবার দায় বস্তুর ছিলনা। বরং এটি পরে স্থানীয়ভাবে ঘন হয়ে কোথাও কোথাও অনেক উত্তপ্ত থাকতে পেরেছে। অন্যদিকে সেই বিকিরণ শক্তি মহাবিশ্বের স্থানের সঙ্গে প্রসারিত হয়ে ক্রমে আরো পাতলা ও আরো শীতল রূপ পরিগ্রহ করে আজ সবকিছুর একটি নগণ্য পটভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এসব কারণেই আমরা বিগ্ ব্যাং এর পর থেকে দশ লক্ষ বছরের ঐ আদি সময়টিকে বলেছি সৃষ্টির প্রথম উৎসব। কিন্তু আমাদের দিক থেকে সৃষ্টির আসল উৎসব শুরু হতে তখনো বাকি। সেটি এসেছে গ্যালাক্সি ও তারার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, সেটিই যেন আমাদের জগতের শুরু।

বস্তুর পুঞ্জীভবনে আমাদের জগতের শুরু

মহাবিশ্বে অন্ধকার যুগ

বিগ ব্যাং এর দশ লক্ষ বছর পরে এসে শক্তি উন্মুক্ত হয়ে গেল, মহাবিশ্ব স্বচ্ছ হলো, বস্তুর পরমাণুও সৃষ্টি হলো। সৃষ্টির এই প্রথম উৎসবে বিকিরণের যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ ছিল তাতে তখনকার এ শক্তি ছিল দৃশ্যমান আলো রূপে। কাজেই সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব সেদিন ছিল এ আলোর আভায় আলোকিত। কিন্তু আরো প্রসারণের ফলে শিগ্‌গির ঐ দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ বড় হয়ে অদৃশ্য বিকিরণে পরিণত হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াতেই শেষ পর্যন্ত এটি এখন CMB রূপে মাইক্রোওয়েভের অনেক বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘে পরিণত হয়েছে। কাজেই মুক্ত শক্তিতে আলোর আভা দেখা দেবার কিছুকাল পরেই মহাবিশ্ব প্রবেশ করেছিল এক অন্ধকার যুগে, সবকিছু দারুণ আঁধারে। আজ যে মহাবিশ্ব তারায় তারায় আলোকিত সেদিন সে অবস্থা ছিল না, কারণ তখনো তারা গঠিতই হয়নি। শক্তির প্রাধান্য শেষ হয়ে বস্তুর প্রাধান্য শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু সে বস্তু শুধু হালকা হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরমাণু– সারা মহাবিশ্বে সমান ভাবে বিস্তৃত ঝিরঝিরে পাতলা গ্যাস। এর মধ্যে কোথাও অধিক ঘনত্ব অর্জন, বা কেন্দ্রীভূত শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়নি– তারা সৃষ্টির মাধ্যমে পরে যা হয়েছে। এই সাময়িক অন্ধকার যুগ অবশ্য এক পর্যায়ে শেষ হয়ে গেল মহাবিশ্বের প্রায় ৪০ কোটি বছর বয়সে, প্রথম তারাগুলো সৃষ্টি ও প্রজ্জ্বলিত হবার মাধ্যমে। এরপর সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্ব আর কখনো অন্ধকারে পড়েনি।

কিন্তু তারার এই সৃষ্টির কথায় যাবার আগে আমাদেরকে একটি বড় প্রশ্নের সমাধান পেতে হবে। বস্তু যদি সারা মহাবিশ্ব জুড়ে মসৃণ সমান ভাবে বিস্তৃত থাকে তা হলে কোথাও কোথাও তা তারার মত ঘনত্বে জড়ো হবার সুযোগ পেল কী করে? যেহেতু বস্তুর প্রত্যেক পরমাণুর চারিদিকে সমান ভাবেই অন্য পরমাণুগুলো রয়েছে তা হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও তো চারিদিকে সমান ভাবে কাজ করার কথা। এ অবস্থায় ওদের কতগুলো এক এক জায়গায় দানা বেঁধে পুঞ্জীভূত হবার সুযোগ কী ভাবে পাবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মাধ্যমেই এ অধ্যায়ে আমাদেরকে তারার জগতের সৃষ্টির কথায় যেতে হবে।

তা ছাড়া আরো কিছু প্রশ্ন আমাদের সামনে রয়ে গেছে যা পরে একে একে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে হবে। বিগ্ ব্যাং এর মাধ্যমে শুধু হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম, এবং সামান্য পরিমাণে ডিউটেরিয়াম ও লিথিয়াম সৃষ্টি হতে পেরেছিল, যার সবই অতি হালকা। এর

চেয়ে ভারী মৌল সৃষ্টির সুযোগ বিগ্ ব্যাং-এ ছিলনা। আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে বাকি সব মৌলগুলো কী ভাবে সৃষ্ট হলো। যে প্রসারণ মহাবিশ্বের ঘটছে, তা ঘটছে মহাকর্ষণের বিরুদ্ধে গিয়ে। শেষ পর্যন্ত মহাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে এই প্রসারণ কি চলতেই থাকবে, না কি মহাকর্ষণের কারণে এটি আবার সংকোচিত হবে– সেই বিন্দু মহাবিশ্বের দিকে– আদিতে যেমন ছিল। তাছাড়া বিগ্ ব্যাং এর ঠিক মুহূর্তটিতে কী ঘটেছিল, এরপর প্রথম ১০ মিলিসেকেন্ডেই বা কী ঘটেছিল, সে প্রশ্নও তো রয়েই গেছে।

প্রতিসাম্যের সূক্ষ্ম অভাব

CMB যখন প্রথম আবিস্কৃত হয়েছে তখন তাকে সর্বত্র একেবারে সুসম জিনিস হিসেবে দেখা গেছে– যেদিকেই তাকানো যায় একেবারেই মসৃণ ভাবে সমান– এক হাজার ভাগের মধ্যে এক ভাগ সূক্ষ্মতায়ও যদি মাপা হয়, তবুও। অবশ্য এই সুসমতা মাপাটাও খুব সহজ ছিলনা– কারণ পৃথিবীর গতি ইত্যাদির কারণে আপাত পরিমাপে যে তারতম্য আসে তাকে যথাযথ হিসাব করে বাদ দিয়েই এই মসৃণ সমতা পাওয়া গেছে। কিন্তু এই সুন্দর সুসমতাই বিজ্ঞানীদের দারুণ মাথাব্যথার কারণ হলো। এটি ইঙ্গিত করছে যে আজকের CMB যেদিন সৃষ্টি হয়েছিল সেই বিশ্বের আদি কালে ঐ ঝিরঝিরে পাতলা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম বস্তুগুলোও তাহলে একেবারেই সুসম ভাবে বন্টিত ছিল। তাই যদি হয় এরা দানা বেঁধে গ্যালাক্সি ও তারা গঠন করলো কী ভাবে, আজকের পরিচিত বিশ্ব কী ভাবে আসলো, আমরা কী ভাবে এলাম? CMB'র মধ্যে কিছুটা হলেও সুসমতার অভাব খুঁজে না পাওয়া গেলে, এ সবের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিলনা।

এর মধ্যে উপগ্রহের যুগ চলে এলো, নানা রকম উপগ্রহের ক্ষমতা অনেকটা এগিয়েও গেল। ১৯৯৩ সালের দিকে CMB'র মধ্যে সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম কোন তারতম্য অর্থাৎ সুসমতার অভাব খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তার জন্য একটি বড় প্রচেষ্টা নেয়া হলো কসমিক

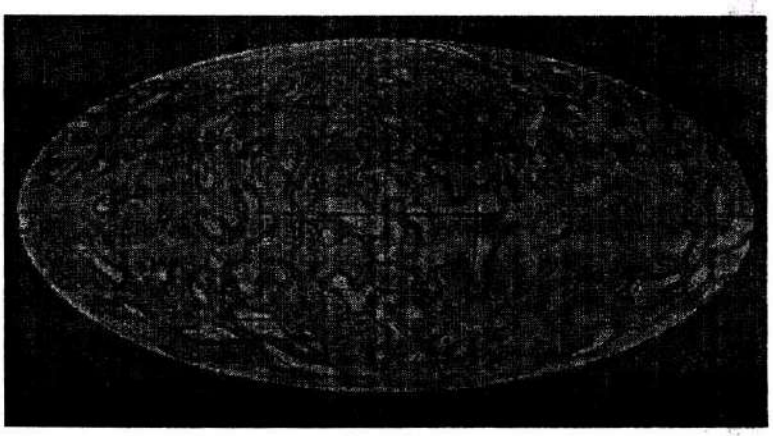

COBE উপগ্রহ থেকে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (CMB)

পুরো আকাশ-গোলক থেকে মাইক্রোওয়েভ ইমেজ উপবৃত্তাকার প্রক্ষেপনে দেখানো হচ্ছে। কালো অংশ গড় উত্তাপে। সাদা অংশ এর থেকে $\frac{২৭}{১০,০০,০০০}$ ভাগ উষ্ণতর। আর ছাই রঙা অংশ $\frac{২৭}{১০,০০,০০০}$ ভাগ শীতলতর।

ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার (মহাজাগতিক পটভূমি অনুসন্ধান) সংক্ষেপে 'COBE'– এই নামে। COBE এর আওতায় উপগ্রহগুলো অতি সূক্ষ্ম পরিমাপের ব্যবস্থা করতে পারল–এবার মহাশূন্য থেকে এক লক্ষ ভাগের মধ্যে এক ভাগ সূক্ষ্মতায় সেটি করা গেল। সেখান থেকে পাওয়া গেল সেই সুসংবাদ। হ্যাঁ ঐ রকম সূক্ষ্মতায় CMB'র মধ্যে ঘনত্বের তারতম্য রয়েছে বৈকি। আর এই তারতম্যই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিগ্ ব্যাং এর দশ লক্ষ বছর পর CMB যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখনকার বস্তুপুঞ্জের ঘনত্বেরই সূক্ষ্ম তারতম্য এর মাধ্যমে ধরা পড়ছে। যেখানে সেই হাইড্রোজেন-হিলিয়াম ঘনত্ব সামান্য একটুকুও বেশি ছিল সেখানে উত্তাপ কমেছে সামান্য একটুকু কম হারে–আর তারই চিহ্ন আজকের CMB সুসমতার এই অতি সামান্য অভাবে। এটিই COBE উপগ্রহ আবিষ্কার করেছে। ১৯৯৩ সালের সেই আবিষ্কারটুকু মহাবিশ্ব গঠন তত্ত্বের জন্য ছিল একটি বড় সুসংবাদ।

তবে এটি আর একটি প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এলো– বস্তু ঘনত্বে ঐ তারতম্য ঘটেছিল কেন, আর ঠিক এমন পরিমাণেই কেন ঘটেছিল যাতে করে আজকের মহাবিশ্বে গ্যালাক্সি বিন্যাস ইত্যাদিতে বস্তুপুঞ্জ ঘনত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়? একেবারের আদিতে মহাবিস্ফোরণের মুহূর্তেই বস্তুঘনত্বে তারতম্য ঘটার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কোয়ান্টাম তত্ত্বের বদৌলতে। কিন্তু সেই তারতম্য এত ছোট যে তা আজকের মহাবিশ্ব গড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কাজেই আনতে হয়েছে আর একটি তত্ত্ব–যা ইনফ্ল্যাশন বা মহাস্ফীতি নামে পরিচিত। এটি ঐ ছোট তারতম্যগুলোকে বড় করে নিয়েছে মহাবিশ্বকে আদিতেই ক্ষণিকের মধ্যে বহুগুণে ফাঁপিয়ে তুলে– সেই সঙ্গে ঐ ছোট্ট তারতম্যগুলোকেও। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমরা পরে আরো ভাল করে দেখবো। তবে এটি অবাক হবার মতো যে তারতম্য ঠিক ঐটুকুই ছিল এবং ঠিক ঐ পরিমাণেই ফুলে ফেঁপে উঠেছে যাতে গ্যালাক্সি সৃষ্টি হতে পারে। যদি তা একটু এদিক ওদিক হতো তা হলে গ্যালাক্সি পুঞ্জীভূত হতো না, আমরাও আসতামনা। এখানেও যেন আবার মহাবিশ্বের মানবমুখিতাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

গ্যালাক্সি সৃষ্টি

ঐ যে ক্ষুদ্র ঘনত্ব তারতম্য সেগুলোই বীজের কাজ করেছে একটানা প্রায় সুসম হাইড্রোজেন হিলিয়াম গ্যাসের মহাবিশ্বের মধ্যে স্থানে স্থানে ঐ গ্যাসকে পুঞ্জীভূত করে তুলতে। একবার কোনখানে ঘনত্ব একটুকুও যদি বাড়ে সেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সামান্য বেড়ে যাবে। তা আরো বস্তুকে সেদিকে আকৃষ্ট করবে। এভাবে সেখানে পুঞ্জীভবন বাড়তেই থাকে। এই পুঞ্জীভবন ঘটেছে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে। প্রত্যেক পর্যায়ে শীতল হতে থাকা গ্যাস ক্রমে ঘনীভূত হয়েছে এবং নিজের মধ্যে ঘূর্ণিত হয়েছে। এই পর্যায়গুলোকে বলা যায় এক একটি স্কেল। প্রক্রিয়াটি এমন ভাবে ঘটেছে যেখানে স্কেলের নিত্যতা বলে একটি নিয়ম মানা হয়। বড় একটি পাতা যদি কিনারায় কুমড়ার পাতার মত খাঁজে বিভক্ত থাকে, প্রত্যেকটি খাঁজ যদি নিজেই ঠিক এভাবে ক্ষুদ্রতর খাঁজে বিভক্ত থাকে, তারও প্রত্যেক খাঁজ যদি আরো ক্ষুদ্রতর একই রকম খাঁজে বিভক্ত থাকে এবং এমনি অসীম ভাবে চলতে থাকে তাহলে সেখানে আমরা স্কেলের নিত্যতা দেখতে পাই– অর্থাৎ সেক্ষেত্রে খাঁজের বিন্যাস, ঘনত্ব ইত্যাদি বড় স্কেলে যেমন ছোট স্কেলেও

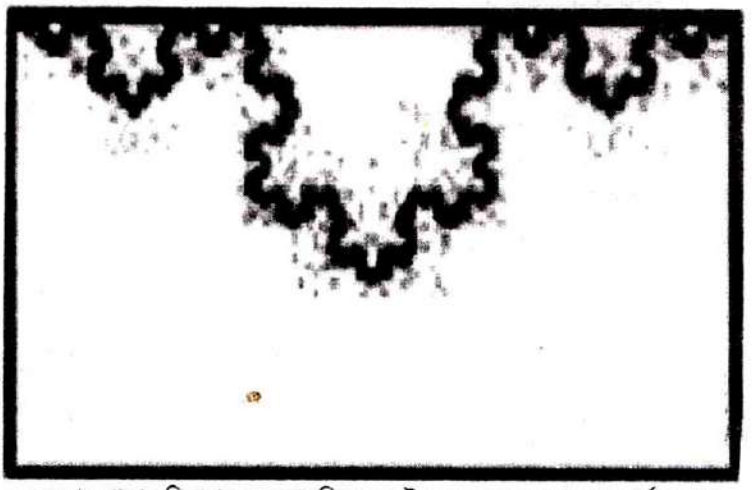

কুমড়ার পাতার কিনারার মত আকৃতিতে একই স্কেল বজায় রেখে নানা পর্যায়

তেমনি। মহাবিশ্বে গ্যাসের পুঞ্জীভবনকে এমনই নানা স্কেলে ঘটতে দেখা গেল। বিগ্ ব্যাং এর প্রায় ৪০ কোটি বছর পর এই পুঞ্জীভবন শুরু হয়ে একশত থেকে দু'শত কোটি বছরের মধ্যে সব চেয়ে বড় স্কেলে গ্যাসপুঞ্জ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেল– যাদের বলা হয় মহাপুঞ্জ। এদের মাঝখানের যে স্থান সেখানকার ঘনত্ব কমে গিয়ে তা স্বচ্ছ জায়গায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক মহাপুঞ্জের ভেতর আবার নানা স্থানে বস্তু আরো ঘনীভূত হয়ে পরের স্কেলের পুঞ্জীভবন হয় এবং এসব পুঞ্জ একই মহাপুঞ্জের মধ্যে থেকে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে আরো ঘন হয়। এর পরের স্কেলের ঘটনাটিও একই রকম। পুঞ্জের মধ্যে একই ভাবে ভিন্ন আয়তনে কিন্তু একই স্কেলে দানা বেঁধেছে আরো ঘনীভূত গ্যাস– এগুলোই গ্যালাক্সি। এক একটি পুঞ্জের মধ্যে ত্রিশটি থেকে হাজারটি গ্যালাক্সি। এভাবে এক একটি মহাপুঞ্জে দশ হাজারের মত গ্যালাক্সি। গ্যালাক্সির পর্যায়েই ঘটেছে তারার সৃষ্টির মাধ্যমে জ্বলে ওঠা মহাবিশ্বের উজ্জ্বল অস্থিত্বগুলো– যেন মহাবিশ্বের ইতিহাস পাড়ি দেবার ক্ষেত্রে আমাদের দিগ্‌দর্শিকা বাতিঘর। আজ মহাবিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কে যা কিছু জানছি তা এই উজ্জ্বলতাকে অনুসরণ করেই প্রধানত জানছি।

অপেক্ষাকৃত ছোট একটি গ্যালাক্সির মধ্যেই থাকতে পারে অন্তত এক'শ কোটি তারা। বড়গুলোতে তো এর চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের নিজের গ্যালাক্সি ছায়াপথে তারার সংখ্যা নিম্নতম ১৪ হাজার কোটি থেকে উর্দ্ধতম ১লক্ষ কোটি পর্যন্ত মনে করা হয়। এক একটি পুঞ্জের গ্যালাক্সিগুলো অবশ্য পরস্পরের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে এতটা আকৃষ্ট যে মহাবিশ্বের ক্রমপ্রসারণ ওদের পর্যায়ে প্রয়োজ্য হয় না। এটি প্রযোজ্য মহাপুঞ্জের পর্যায়ে গিয়ে যারা পরস্পর থেকে ক্রমেই উচ্চ বেগে সরে সরে যাচ্ছে। তাই আমরা দেখি গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সিপুঞ্জগুলো নিজেদের সংবদ্ধ অবয়ব বজায় রেখে একে অপর থেকে দ্রুত বেগে সরে যাচ্ছে।

প্রত্যেক পর্যায়ে গ্যাসের ঘূর্ণিত হওয়ার ধারাবাহিকতায় গ্যালাক্সিও নিজের মধ্যে ঘুরে চলেছে। এদের কিনারার দিকটি দ্রুততর হারে শীতল হয়েছে, ৪০০০ ডিগ্রি কেলভিনের নিচের উত্তাপে চলে এসেছে। বিভিন্ন পুঞ্জের মাঝখানের স্থানগুলোতে বস্তু আর আয়নিত

গ্যালাক্সির বন্টন: পুঞ্জে ও মহাপুঞ্জে

না থেকে স্বাভাবিক গ্যাস ও স্বচ্ছ হয়ে গেছে, এবং এর মধ্য দিয়ে গ্যালাক্সির আভ্যন্তরীণ তাপ বিকীর্ণ হয়ে যেতে পেরেছে। শীতলতর গ্যালাক্সির মানে হলো সেখানকার গ্যাসের বহির্মুখি চাপ কমে যাওয়া এবং এই চাপ কতখানি ওজন সহ্য করতে পারবে তাও কমে যাওয়া। ফলে গ্যালাক্সির মধ্যে যে গ্যাস ক্রমে ঘনীভূত হতে থাকে তা তখন ঘনীভবন কেন্দ্রের উপর ক্রমবর্ধমান ভাবে নিজের ওজনে ধসে পড়তে থাকে এবং সেটি ঠেকাবার শক্তি তার থাকে না। গ্যালাক্সির মধ্যে এভাবে শত শত নিজের মধ্যে ধসে পড়া বিছিন্ন গ্যাসের গোলক সৃষ্টি হয়। একই প্রক্রিয়াতে এই গোলকের মধ্যে আবার সৃষ্টি হয় আরো সংকোচিত বহু উপগোলক। এই শেষোক্তগুলোই শেষ পর্যন্ত এত বেশি ঘনীভূত হয়েছে যে সেগুলো তারা হিসাবে জ্বলে উঠেছে। আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সি ছায়াপথ এরকম অসংখ্য তারায় গড়া। তেমনি বহু দূরের গ্যালাক্সিগুলোকে আমরা তাদের তারাদের আলোতেই উজ্জ্বল হওয়া অবস্থায় দেখি মহাবিশ্বে আমাদের বাতিঘর হিসেবে। তারার মধ্যে নিজের উপর নিজের ধসে পড়া অতি ঘনীভূত গ্যাস সীমিত জায়গায় প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে বলেই সেটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। পরে অবশ্য অন্য কারণে আরো উত্তাপ সৃষ্টি হয়– যে সব আমরা দেখবো তারা নিয়ে আলোচনায়।

নানা রকম গ্যালাক্সি

শক্তিশালী দূরবীক্ষণে গ্যালাক্সিগুলোর অবয়ব যখন থেকে আমরা দেখতে পেরেছি, দেখেছি আকার আকৃতিগত দিক থেকে এদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করা যায়। অধিকাংশ গ্যালাক্সি চেপ্টা চাকতি আকৃতির এবং উপবৃত্তাকার। এতে বাইরের দিকের ঘনীভূত গ্যাসের গোলকগুলো কেন্দ্রীয় গোলকগুলোর চারিদিকে দ্রুত গতিতে আবর্তন

করতে থাকে। পুরো জিনিসটি যেন একটি ঘুরন্ত চাকতি। গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় স্থানে গোলকগুলো এত বেশি ঘনীভূত হয় যে এদের ভর নিজের উপর নিজে ধসে পড়ে প্রচন্ড ঘনত্বের সৃষ্টি করে। এত প্রচন্ড যে সেখানে ব্ল্যাক হোলের সৃষ্টি হয়। ফলে আগে যেভাবে দেখেছি এখানে গ্যালাক্সির কেন্দ্রেই সৃষ্টি হতে পারে গ্যালাক্সি জগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক কোয়াজার। এরা এত বেশি উজ্জ্বল যে এখন পর্যন্ত আমরা সর্ব দূরবর্তি যে জ্যোতিষ্কের সন্ধান পেয়েছি তা এই কোয়াজার– প্রায় এক হাজার আলোক-বর্ষে দূরে, জানা মহাবিশ্বের প্রায় শেষ সীমানায় অবস্থিত। এত দূরে থাকার কারণও হলো এগুলোর সৃষ্টি মহাবিশ্বের প্রথম যুগে– বিগ্ ব্যাং এর মাত্র দু' এক শত কোটি বছরের মধ্যে। ওদের মধ্যে আমরা মহাবিশ্বের প্রাচীনতম জ্যোতিষ্কগুলোকে দেখছি।

যে ধরনের গ্যালাক্সি আমরা সব চেয়ে বেশি দেখি তা হলো স্পাইরাল (প্যাঁচানো) গ্যালাক্সি যার অবয়বে রয়েছে বৈশাখি মেলার কাগজের ফুরফুরির আকৃতিতে লম্বা লম্বা প্যাঁচানো চক্রবাহু, যা দেখলেই বুঝা যায় এটি ফুরফুরির মত ঘুরছে। এসব বাহুতে গ্যাসের মধ্যে দিয়ে ঘূর্ণিত থাকে এক ধরনের চাপের তরঙ্গ, যা পালাক্রমে গ্যাসকে সংকোচিত করে গ্যালাক্সির এ অঞ্চলে নূতন নূতন তারা সৃষ্টি করে চলে। তাই নূতন তারাগুলোর অবস্থান ঐ চক্রবাহুতে গ্যালাক্সির কিনারার দিকে, আর পুরানো তারাগুলোর অবস্থান গ্যালাক্সির কেন্দ্রে। এই স্পাইরাল গ্যালাক্সিগুলো সব চেপ্টা চাকতি আকৃতির, শুধু মাঝখানটাতেই কিছুটা বেশি পুরু। আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সি ছায়াপথ এরকমই একটি স্পাইরাল গ্যালাক্সি। গত শতাব্দীর শুরুর দিক পর্যন্তও মনে করা হতো দৃশ্যমান মহাকাশের পুরোটাই আমাদের এই ছায়াপথই। ছায়াপথ যে অসংখ্য গ্যালাক্সির মাত্র একটি তা বুঝতে অনেকদিন লেগে গিয়েছে। হবেই না বা কেন? এই ছায়াপথের ব্যাস প্রায় এক লক্ষ আলোক-বর্ষ আর এর পুরুত্ব হাজার খানেক আলোক-বর্ষ। এর সামগ্রিক উজ্জ্বলতা এক হাজার কোটি সূর্যের সমান। গড়পড়তা অনেক গ্যালাক্সি এরকমই। আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে এই যে অসংখ্য গ্যালাক্সি আবিষ্কার, ও তাদেরকে বিস্তারিত

একটি স্পাইরাল গ্যালাক্সিতে অসংখ্য তারার বন্টন

অবয়বে, চক্রবাহু ইত্যাদি সব নিয়ে, দেখার সুযোগ ঘটেছে, তা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দূরবীক্ষণের পরবর্তী অসামান্য উন্নতিগুলোর ফল।

স্পাইরাল গ্যালাক্সি ছাড়া আর যে আকৃতির গ্যালাক্সি প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে, সেগুলো হলো উপবৃত্তাকার। এদের সেই প্যাঁচানো চক্রবাহু থাকেনা– মোটামুটি খানিকটা লম্বাটে গোলগাল অবয়ব– চেপ্টা নয়। এদের ঘূর্ণনও অপেক্ষাকৃত কম। গ্যালাক্সিপুঞ্জের মাঝখানের দিকে থাকে এরকম গ্যালাক্সিগুলো। তারার যুগ সূচনার অপেক্ষাকৃত প্রথম দিকেই এদের তারাগুলো দ্রুত গঠিত হয়েছে। অন্যদিকে স্পাইরাল গ্যালাক্সিগুলোর তারা সৃষ্টি হয়েছে প্রায় হাজার কোটি বছর ধরে ধীরে ধীরে। আমরা পরে দেখবো প্রথম প্রজন্মের তারাগুলোর পর পরবর্তী প্রজন্মের তারাগুলোর সৃষ্টির সময় গ্যালাক্সির মধ্যে গ্যাস ছাড়াও ধূলির মেঘও সৃষ্টি হয়েছে। প্রচন্ড ঘূর্ণনে ঐ ধূলি-মেঘগুলোর সংঘর্ষেই গ্যালাক্সির কিনারায় অস্থিতিশীল অংশটি চক্রবাহুর রূপ নিয়েছে স্পাইরাল গ্যালাক্সিতে।

মহাবিশ্বে গ্যালাক্সির সংখ্যা কত? হাবল স্পেস টেলিস্কোপ মহাবিশ্বের এক একটি দিকে তাক করে যতগুলো গ্যালাক্সির ছবি নিতে পেরেছে, তার থেকে হিসেব করে এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের কাছে দৃশ্যমান মহাবিশ্বে গ্যালাক্সির সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার কোটি। এখনো আমাদের উদ্ঘাটন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার বিবেচনায় এর প্রকৃত সংখ্যা ৮০ হাজার কোটির মত হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ মহাকাশে স্থাপনের পর থেকে মহাবিশ্বের সুদূরতম প্রদেশেরও স্পষ্ট ঝকঝকে ছবিতে সেখানকার গ্যালাক্সিপুঞ্জগুলোকে চমৎকার দেখা সম্ভব হয়েছে, আর গ্যালাক্সির ফাঁকে ফাঁকে গ্যাস-ধূলিকণার মেঘ। এরকম স্পষ্ট ছবি পাওয়ার কারণ হলো বায়ুমন্ডলের বাইরে থেকে দেখতে পারা। বায়ুমন্ডলে নানা বিন্দুতে উত্তাপের ইতস্তত ভিন্নতা থাকে। ফলে আলো তার মধ্য দিয়ে আসার সময় আলোর পাশাপাশি তরঙ্গমালাগুলো একই তালে আসতে পারেনা, তাদের পরস্পরের মধ্যে সামান্য দশা-পরিবর্তন ঘটে– এর ফলে দেখা ছবিতে অস্পষ্টতা দেখা দেয়। বায়ুমন্ডলের বাইরে এই ব্যাপারটি ঘটতে

পারেনা। কিন্তু অতদূরে মহাশূন্যে স্থাপিত টেলিস্কোপে ইচ্ছে মত যন্ত্রপাতি সংস্থাপন সম্ভব হয়না, সামান্য মেরামত করতে হলেও মহাশূন্যচারীকে বিরাট আয়োজন সেখানে পাঠাতে হয়, আর বিজ্ঞানীরাও সারাক্ষণ এর সান্নিধ্যে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেননা। এখন অতি সম্প্রতি ভূপৃষ্ঠেই বাইনোকুলার টেলিস্কোপে পাশাপাশি দুটি দূরবীনের একটিতে আসা আলোর দশা পরিবর্তন অন্যটিরটি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের ব্যবস্থা করে ভূপৃষ্ঠেই হাবল টেলিস্কোপের সমমানের স্পষ্ট ছবি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

প্রথম তারা সৃষ্টি

প্রথম প্রজন্মের তারাগুলো সৃষ্টি হয়েছিল অতি সামান্য লিথিয়াম ও ডিউটোরিয়াম ছাড়া প্রায় সর্বাংশে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামে গড়া গ্যাস থেকে। এটি মূলত বিগ্ ব্যাং এর পরপর আয়ন হিসাবে সৃষ্টি হয়ে পরে গ্যাসের রূপ পেয়েছিল। প্রায় ৭৬% হাইড্রোজেন ও ২৪% হিলিয়াম এভাবে সৃষ্টি হওয়াটিকে আমরা বিগ্ ব্যাং এর অন্যতম প্রমাণ হিসাবে ইতোমধ্যে দেখেছি। বিভিন্ন পর্যায়ের ঘনত্ব তারতম্যের ধারাবাহিকতায় গ্যালাক্সির মধ্যে নানা স্থানে এরকম ঘনত্ব তারতম্য বিভিন্ন আয়তনের তারার সৃষ্টি করে। এসব স্থানে গ্যাস এত পুঞ্জীভূত হয় যে তার কেন্দ্রস্থলের উপর প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি হয়। বাইসাইকেলের টায়ার টিউবে পাম্প করে তার মধ্যে আমরা যত চাপের সৃষ্টি করি তাকে ততই উত্তপ্ত হতে দেখি। একই কারণে তারার মধ্যে গ্যাস সংকোচিত হয়ে কেন্দ্রে চাপ যত বাড়ে সেখানটি তত প্রচন্ড ভাবে উত্তপ্ত হতে থাকে। এই উত্তাপ এক পর্যায়ে যখন এক কোটি ডিগ্রিতে গিয়ে পৌঁছে তখন গ্যাসের আয়নে দুটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস ফিউশন প্রক্রিয়ায় একীভূত হয়ে হিলিয়াম আয়নে পরিণত হবার মাধ্যমে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন শুরু হয়– যে রকম ফিউশন পারমাণবিক শক্তি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে সৃষ্টি হয়। এভাবে তারার কেন্দ্রস্থল একটি প্রচন্ড শক্তি উৎসে পরিণত হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই পুরো ঘটনায়– গ্যাস সংকোচিত হয়ে এবং পরে ফিউশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে তারায় পরিণত হতে কত সময় লাগে? কম্পিউটার মডেলিংএ দেখা গেছে সংকোচন ক্রিয়াতেই লেগে যায় ৩০-৪০ লক্ষ বছর। কোটি খানেক বছরের মধ্যে একটি তরুণ তারার জন্ম হয়। তখন তার কেন্দ্রে ফিউশন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ক্রমে হিলিয়ামে পরিণত হতে থাকে এবং শক্তি উৎপাদিত হতে থাকে। বিভিন্ন তারায় তাদের ভরের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন সময় ধরে এ পর্যায় স্থায়ী হয়, ৬ কোটি বছর থেকে বহু হাজার কোটি বছর পর্যন্ত। যেমন আমাদের সূর্য প্রায় ৫ শত কোটি বছর ধরে এই অবস্থাতেই রয়েছে, আরো ৫ শত কোটি বছর থাকবে।

একেবারে প্রাথমিক যুগের পর যে সব তারা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো পরবর্তী প্রজন্মের তারা। ইতোমধ্যে সৃষ্ট তারাগুলোর জীবনকালে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে হিলিয়াম ছাড়াও, প্রায় একই পদ্ধতিতে আরো বিভিন্ন ভারী মৌল তৈরি করেছে। সব চেয়ে ভারীগুলো অবশ্য তৈরি হয়েছে জীবনকালের শেষে এসে কোন কোন তারার সুপারনোভা হিসাবে বিস্ফোরণে ফেটে পড়ার মাধ্যমে। এসব প্রক্রিয়ার বিস্তারিত আমরা একটু পরেই দেখবো। ওভাবে ফেটে পড়ে তারার সকল বস্তু ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশের স্থানে। তাই তারার ফাঁকে ফাঁকের স্থানগুলোতে ভূতপূর্ব তারার দেহের ভগ্নাংশগুলো থেকে সৃষ্টি হয়েছে

ধূলিকণার মেঘ। পরবর্তী প্রজন্মের তারাগুলো সৃষ্টির কাঁচামাল শুধু আগেরগুলোর মত হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামই নয়। এই গ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাঁচামাল হিসাবে আগের তারার ভগ্নাংশ দিয়ে গড়া ধূলির মেঘ। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মান্তরে তারার দেহ বস্তুগুলো রিসাইকেল বা পুনরাবর্তিত হতে থাকে। আমাদের সূর্যও এরকম একটি পরের প্রজন্মের তারা। তাই এর মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের সঙ্গে কিছু পরিমাণে অন্যান্য মৌলগুলোও এর জন্মের সময়েই এসে গেছে, যার ভাগ এর থেকে পৃথিবীতে আমরাও পেয়েছি।

তারার ফাঁকে ফাঁকের বস্তু

শুরুতে তারার ফাঁকে ফাঁকে ছিল সেই আদি বস্তু হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম– যার ঘনত্ব এখানে খুবই পাতলা, কারণ এর অধিকাংশ তারাতে পুঞ্জীভূত হয়েছে। আর এই কারণে এখানে এর উত্তাপ যথেষ্ট কমে গিয়েছে। পরে বৃদ্ধ বড় তারাগুলো সুপারনোভা রূপে ফেটে গিয়ে তাদের মধ্যে সৃষ্ট নানা ভারি মৌলগুলোও এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে, যদিও অবশ্য তা হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের তুলনায় অনেক স্বল্প পরিমাণে। অক্সিজেন ও কার্বন উভয়ে এর মধ্যে থাকায় তারার ফাঁকে ফাঁকে সৃষ্টি হয়েছে কার্বন-মনো-অক্সাইড। তাছাড়া এর পর থেকে অক্সিজেন এখানকার অন্যান্য মৌলগুলোকে অক্সিডাইজ করে আরো নানা যৌগ গঠন করেছে। ধাতব মৌলগুলো এভাবে অধিকাংশ অক্সাইডে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া একই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে জলীয় বাষ্প। এর ফলে মহাবিশ্বে কার্বন-মনো-অক্সাইড

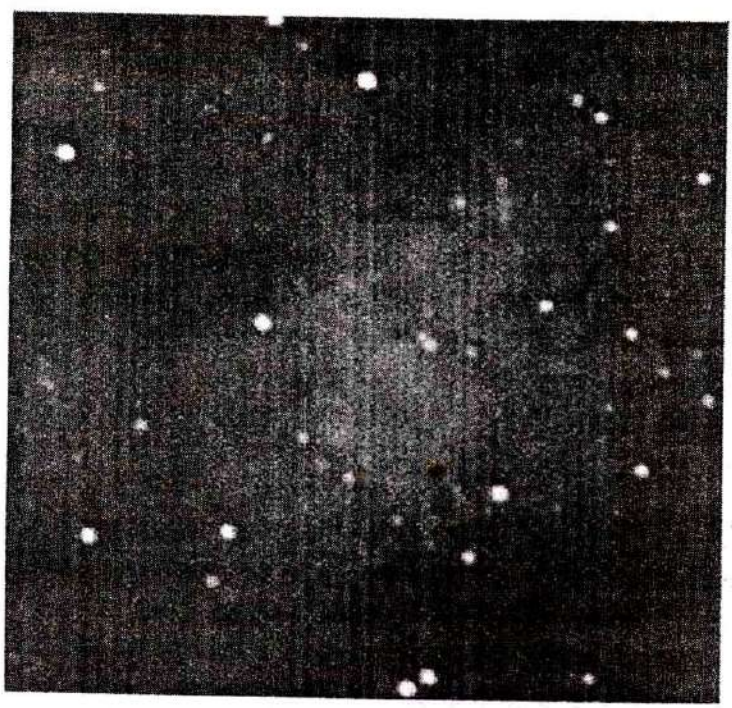

তারা এবং তারার ফাঁকে ধূলি-মেঘ (হাবল স্পেস টেলিস্কোপে)

ও জলীয় বাষ্প একটি বড় স্থান দখল করেছে। সিলিকন হয়ে পড়েছে সিলিকেট– যা কিনা সাধারণ মাটি ও বালির গঠন। এর কণার উপর জমেছে জলীয় বাষ্প জমাট বেঁধে বরফ আস্তরণ। এভাবে তারার ফাঁকে ফাঁকে আবির্ভূত হয়েছে মহাবিশ্বের প্রথম কঠিন পদার্থ– যদিও প্রথমে শুধু বরফাবৃত সূক্ষ্ম ধূলিকণা রূপে। অধিক ভর সম্পন্ন তারাগুলোর আশপাশের স্থানে এমনটি ঘটলেও কম ভরের তারাগুলোর কাছে ধূলিকণায় অক্সিডেশনের পরিবর্তে ঘটেছে রিডাকশন (বিজারণ)। তাই কার্বন-মনো-অক্সাইডের বদলে সেখানে আছে কার্বন। সেখানে এভাবে সিলিকেট কণার পরিবর্তে বেশি দেখা দিয়েছে ক্ষুদ্র গ্রাফাইট অথবা হীরারূপী কার্বন ধূলিকণা, এবং একইভাবে লৌহ কণা। আরো পরের প্রজন্মের তারাগুলোর প্রভাবে তারার ফাঁকে ফাঁকে এসেছে নাইট্রোজেনের দ্বারা গঠিত সায়ানাইড এবং হাইড্রো-সায়ানিক এসিড।

তারার ফাঁকে ফাঁকের এ সব বস্তু সৃষ্টি করেছে এক ধরনের ধূলি-মেঘের যা বিভিন্ন ঘনত্বে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। বিশেষ করে স্পাইরাল গ্যালাক্সির প্যাঁচানো চক্রবাহুগুলোর কাছে এরকম বিশাল বিশাল মেঘ দেখা যায় পরিসর ১০ থেকে ১০০ আলোক-বর্ষও হয়ে থাকে। ঘনত্বের কথা যদি বলি, এতে এক কিউবিক সেন্টিমিটার জায়গায় কয়েকটি মাত্র ক্ষুদ্র কণা থেকে এ রকম বহু লক্ষ কণাও থাকতে পারে। ঘনত্বের উপর নির্ভর করে এই ধূলি-মেঘগুলো কম বা বেশি স্বচ্ছ। আধুনিকতম দূরবীক্ষণে এদের চমৎকার সব ছবি নেয়া সম্ভব হয়েছে।

পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের তারা সৃষ্টি

তারার ফাঁকে ফাঁকে ধূলি-মেঘ ও অন্যান্য বস্তু সৃষ্টির পর থেকে এগুলো পরবর্তী প্রজন্মের তারা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গ্যালাক্সির মধ্যে স্থানে স্থানে এই গ্যাস ও ধূলিকণা ঘনীভূত হয়ে, নিজের উপর ধসে পড়ে, এসব পরবর্তী প্রজন্মের তারা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। এদের কেন্দ্রের উচ্চ চাপের কারণে উচ্চ উত্তাপও সৃষ্টি হয়। পরে এরকম বড় ঘন অংশ ভেঙ্গে অনেকগুলো টুকরা হয়ে যায়– যার প্রত্যেকটি টুকরা আবার নিজেরা ঘনীভূত ও উত্তপ্ত হতে থাকে– এবং এক একটি পৃথক তারার সূচনা পর্যায়ে পরিণত হয়। শুরুর এই অবস্থাকে বলা হয়– প্রোটোষ্টার বা প্রাক-তারা, সেখান থেকেই বিকশিত হয় তারা। গ্যালাক্সি ইত্যাদির ঘূর্ণনের ধারাবাহিকতায় তারার মধ্যেও সঞ্চারিত হয় ঘূর্ণনের ভরবেগ (মোমেন্টাম)। তাই নিজের কেন্দ্রীর অক্ষের চারদিকে তারার উপাদানগুলো দ্রুত আবর্তিত হয়– যার কেন্দ্রে থাকে একটি ঘন উত্তপ্ত গোলক আর তার বাইরে অক্ষ থেকে দূরে একই ভাবে ঘূর্ণায়মান থাকে জড়ো হওয়া ধূলি-কণা। এরা অনেক কম ঘনত্বে ও উত্তাপে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হতে হতে ঘুরতে থাকে। এই শেষের জিনিসগুলো মূল তারার চারিদিকে একটি ঘূর্ণায়মান চাকতির সৃষ্টি করে– ঘুরতে ঘুরতে ক্রমাগত আরো বস্তু সংগ্রহ করে বলে একে বলা হয় সংগ্রহ চাকতি। সম্প্রতি মহাশূন্য থেকে দূরবীক্ষণে ছবি তোলার যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে মহাবিশ্বে নূতন তারা সৃষ্টির এ দৃশ্য আমরা দেখতে পেয়েছি– বিকাশমান তারার কেন্দ্রীয় উত্তাপের আলোতে বাইরের সংগ্রহ চাকতি এতে দেখা গেছে।

তারার কেন্দ্রে চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপও বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম প্রজন্মের তারার

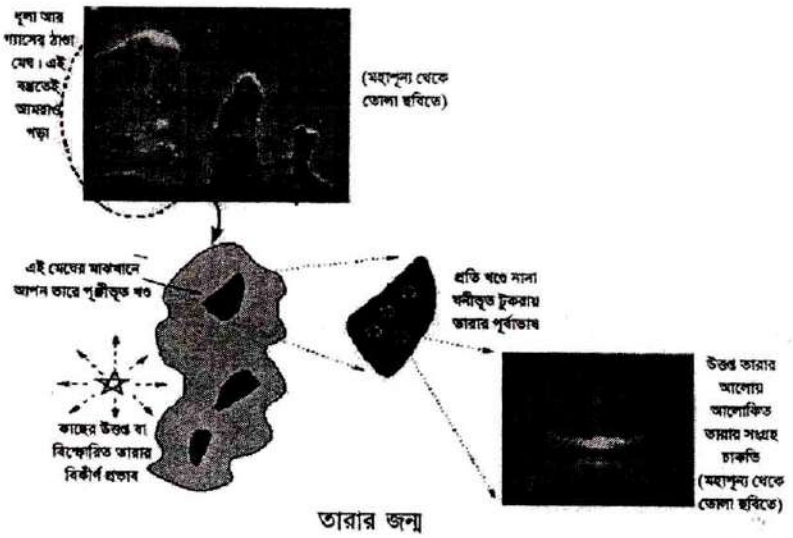

তারার জন্ম

মতই এতে থাকে অধিকাংশই হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। কিন্তু প্রথম প্রজন্মে যা ছিল না, এখন তাও যোগ হয়– কিছু পরিমাণে ভারী মৌলের আয়ন। অবশ্যই এর সবই থাকে খুবই উত্তপ্ত আয়নিত অবস্থায়– বিশেষ করে কেন্দ্রে। কেন্দ্রের উত্তাপ যখন ১ কোটি ডিগ্রিতে গিয়ে পৌঁছে তখনই শুরু হয় ফিউশন নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া। এর ফলে হাইড্রোজেন সংযুক্ত হয়ে হিলিয়ামে পরিণত হতে থাকে আর ক্রমাগত শক্তি উৎপাদন করে তারা শক্তি বিকীর্ণ করতে থাকে। কেন্দ্রে উত্তাপ কোটি ডিগ্রি হলেও তারার অবয়ব ভেদ করে বাইরে আসতে আসতে এ উত্তাপ কমে মাত্র কয়েক হাজার ডিগ্রিতে পরিণত হয়। তারা থেকে আমরা যে বিকিরণের খবর পাই, তা এই বাইরের কম উত্তপ্ত গ্যাস থেকে বিকিরণের খবর।

এই বিকিরণের বর্ণালী বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি তারার বাইরের অংশের উত্তাপ, সেখানে কী কী মৌল আছে, সেখানে বস্তুর ঘনত্ব, চাপ, পরিচলন, গতি বেগ, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদি নানা খবর। তারার মোট ভরের উপর তারার বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে এসব গুণাগুণের পরিস্থিতি নির্ভর করে। যেমন যদি উত্তাপের কথাই ধরি, তারার রঙ থেকেই বাইরের উত্তাপ অনেকখানি আন্দাজ করা যায়। লাল রঙের তারাগুলো অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত– এদের বাইরের উত্তাপ ৩০০০ ডিগ্রির কোঠায়। হলুদ রঙেরগুলো বেশি উত্তপ্ত, ৬০০০ ডিগ্রির মত, আমাদের সূর্য সেই দলে। অতি উত্তপ্ত তারাগুলোর রং সাদা, যাদের বাহিরটা ১০,০০০ ডিগ্রির মত উত্তপ্ত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের পরিচিত তারা সিরিয়াস এই দলে। তারো চেয়ে উত্তপ্ত তারা ঈষৎ নীল রঙের হয়, সেগুলোর বাইরের উত্তাপ ২০,০০০ ডিগ্রিও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

তারার জীবন ও আমাদের দেহ

সুদূর তারকারাজির সম্মিলিত উত্তরাধিকার আমাদের দেহে

আগেই বলেছি হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম ছাড়া সব মৌলই এসেছে তারার মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর কারণে। আর এ ঘটনাগুলো তারার সৃষ্টি থেকে বার্ধক্যে বিলোপ পর্যন্ত তার বিবর্তনের নানা পর্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এসব মৌলের মধ্যে এমন সবগুলো আছে যেগুলো আমাদের দেহের অপরিহার্য উপাদান। যেহেতু মৌলের পরমাণু যেটি যেখানেই যাক না কেন, যে বস্তুই গড়ুক না কেন, তা নিজে অক্ষয় থাকে। তাই বহুবার বহু তারায় রিসাইক্লিং হয়েও সূর্যে এবং পৃথিবীতে এসে এটি যখন প্রাণি জগতের বা আমাদের দেহের অংশ হয়েছে, তখনো মহাবিশ্বে সৃষ্ট সেই আদি পরমাণুগুলোই আছে।

মহাবিশ্বের আনাচে কানাচে ঐ মৌলগুলোর সমন্বয়ে যে রাসায়নিক যৌগ তৈরি হতে পেরেছিলো তারও কিছু কিছু পৃথিবীতে এসেছে। তার মধ্যে জীব-দেহের জন্য অপরিহার্য কিছু উপাদানও ছিল। যেমন পৃথিবীতে জীবজগতের শুরুর জন্য অপরিহার্য তিনটি যৌগ– পানি, ফর্মালডিহাইড এবং হাইড্রো-সায়ানিক এসিড যে তারার ফাঁকে ফাঁকে গ্যাস ও ধূলিকণা রূপী মেঘের মধ্যে রয়েছে এবং ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এদের কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেনের উৎস কিন্তু তারার মধ্যেই। এখন যেই তত্ত্ব খুবই জোরালো হয়ে উঠেছে তা হলো যে সব অসংখ্য উল্কা ও ধূমকেতু অতীতে পৃথিবীতে আছড়ে এসে পড়েছে তারাই ঐ তিনটি প্রাণ-সৃজনকারী যৌগ মহাবিশ্বের নানা অঞ্চল থেকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে। যেমন পৃথিবীর আজকের জলভাগের একটি প্রধান উৎসই মনে করা হয় পৃথিবীর শৈশবে আসা উল্কা আর ধূমকেতুকে। অনেকে তো একেবারে আদি জীবও এভাবে উল্কা বাহিত হয়ে মহাবিশ্ব থেকে এসেছে মনে করেন। যদিও এই মতটি এখন গৌণ, তবুও মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও বিবর্তনের সঙ্গে আমাদের দেহের অণু পরমাণু যে এক সূত্রে গাঁথা এ কথা এখন প্রমাণিত।

মূল ধারার তারা

মোটামুটি সব তারা একই রকম সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও একই ইতিহাস অনুসরণ করলেও একটি তারার জীবনের পর্যায়গুলো কোন দিকে এগুবে সেটি নির্ভর করে তার ভরের উপর। জন্মের সময় যে বস্তুভর নিয়ে একটি তারা যাত্রা শুরু করেছে তা নানা রকম হতে পারে,

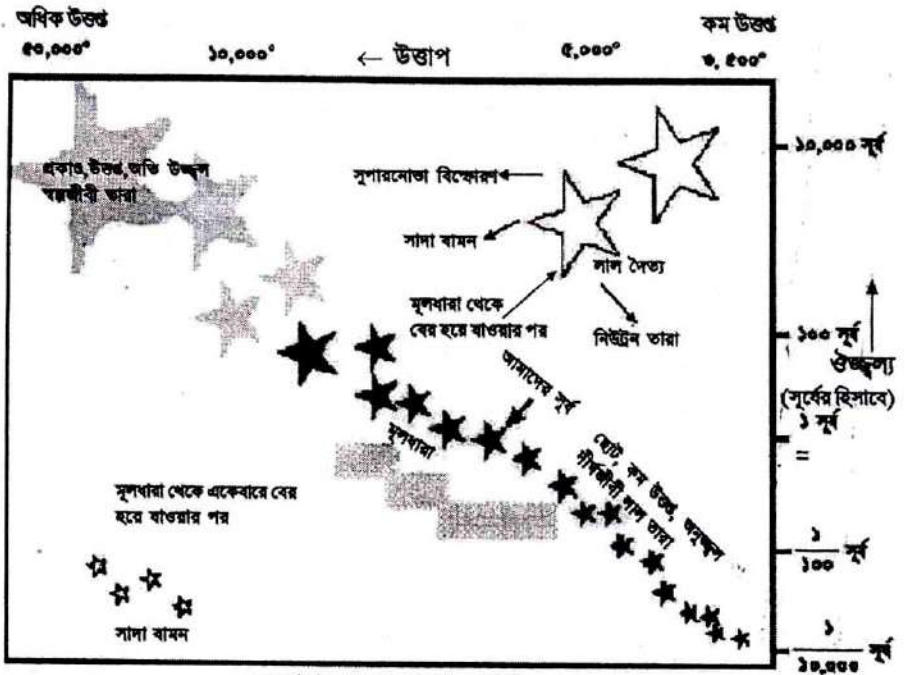

মূলধারা ও নানা ধরনের তারা

সে সময়কার স্থানীয় পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। আমাদের সূর্য একটি অপেক্ষাকৃত কম ভরের তারা, যদিও তার চেয়েও অনেক কম ভরের তারা রয়েছে। সাধারণত সূর্যের ভরকেই অন্য তারার ভর প্রকাশের একটি একক হিসাবে নেয়া হয়। যেমন তারার ভর যদি ৩০ সূর্য বলি, সেটি সূর্যের চেয়ে ৩০ গুণ ভারি।

জীবনের অধিকাংশ সময় একটি তারা ঠিক সেই পর্যায়ে থাকে যা আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। এর কেন্দ্র প্রায় এক কোটি ডিগ্রি উত্তপ্ত হয়ে নিউক্লিয়ার ফিউশন শক্তি উৎপন্ন করে তা বিকীর্ণ করছে, হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম সৃষ্টি হচ্ছে। একে আমরা বলতে পারি মূল ধারার পর্যায়। তারার ভর যত বেশি হবে এই মূল ধারায় তার অবস্থানকাল হবে তত কম– কারণ অধিক ভরের চাপে দ্রুততর বেগে জ্বলে সে তার কেন্দ্রের হাইড্রোজেন জ্বালানি দ্রুত শেষ করবে এবং তার বাইরের উত্তাপও হবে তুলনামূলক ভাবে বেশি। কাজেই আমরা এগুলোকে নীল বা সাদা তারা হিসাবেই তখন দেখবো। এদের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যও সে রকম বেশি হবে, যদিও আমরা তাকে কত উজ্জ্বল দেখবো না দেখবো তা নির্ভর করবে এটি আমাদের থেকে কত দূরে তার উপর। প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যটিকেও সূর্যের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যের মাপে পরিমাপ করা হয়। যেমন ৩০ সূর্য ভরের একটি তারার মূল ধারায় থাকা কালীন প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য হবে সূর্যের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি। একে আমরা বলবো ১০,০০০ সূর্য ঔজ্জ্বল্য। একটি গ্রাফের X অক্ষে বাম থেকে ডানে বেশি থেকে কম উত্তাপ, এবং Y অক্ষে নিচ থেকে উপরে কম থেকে বেশি ঔজ্জ্বল্য– এভাবে সাজিয়ে বিভিন্ন ভরের তারাগুলোর জন্য বিন্দু স্থাপন করলে অধিক ভরের

তারাগুলো গ্রাফের উপরে বামে এবং কম ভরের তারাগুলো নিচে ডানে স্থান পাবে (লেখচিত্র দেখুন)। তাদের যোগ করা ঈষৎবক্র রেখাটিকে মূল ধারা বলা যেতে পারে। উত্তাপ আর ঔজ্জ্বল্যের বিচারে অনেক তারার অবস্থান মোটামুটি এই মূল ধারায়, নিজ নিজ ভর অনুযায়ী নিজস্ব স্থানে। চিত্রে ৩০ সূর্য থেকে ০.৩ সূর্য পর্যন্ত বিভিন্ন রকম ভরের তারার অবস্থান মূলধারায় দেখানো হয়েছে। মনে রাখতে হবে সূর্যের ভর এক সূর্য, এর বাইরের উত্তাপ ৬০০০ ডিগ্রি এবং এর ঔজ্জ্বল্য এক সূর্য।

লাল দৈত্য

তারা কিন্তু চিরকাল মূল ধারায় থাকে না। আমরা দেখেছি যার ভর যত বেশি তা এখানে থাকে তত কম সময়। ৩০ সূর্য ভরের তারা এখানে থাকে মাত্র ৬ কোটি বছর, ১০ সূর্য ভরের তারা থাকে ১০ কোটি বছর। আর আমাদের সূর্য থাকবে (এক সূর্য) এক হাজার কোটি বছর। সূর্যের সৃষ্টির পর ইতোমধ্যে এ সময়ের অর্ধেকটি সময় কেটে গিয়েছে। আরো ৫০০ কোটি বছর সূর্য মূল ধারায় থাকবে, তারপর মূল ধারার পর্যায় থেকে সরে একটি অন্য রূপ গ্রহণ করবে– যাকে বলা যায় লাল দৈত্যের পর্যায়। আগে পরে প্রায় সব তারাকেই এভাবে লাল দৈত্য হতে হয়, যদি না অবশ্য তার ভর খুবই কম হয়।

এটি ঘটে যখন তারার কেন্দ্রের হাইড্রোজেন জ্বালানী ফুরিয়ে যায়। কাজেই সেখানে নিউক্লিয়ার ফিউশন শক্তি আর উৎপাদিত হতে পারে না। নিজের কেন্দ্রের দিকে নিজের পতন ঠেকিয়ে রাখার মত শক্তি না থাকায় সে রকম পতন ও চাপবৃদ্ধি ঘটতে থাকে– উত্তাপও বেড়ে যায় তাই। এর ফলে যে অধিক উত্তাপ বাইরের দিকে আসতে পারে তাতে অপেক্ষাকৃত বাইরের দিকের হাইড্রোজেনেও প্রয়োজনীয় এক কোটি ডিগ্রি উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে সেখানেই নিউক্লিয়ার ফিউশন শক্তি উৎপাদিত হতে থাকে এবার। কেন্দ্রে না হয়ে বাইরের দিকে হওয়াতে এই শক্তিকে এখন অত চাপকে ঠেকানোর কাজ করতে হয়না। বরং এটি এখন ব্যবহৃত হয় তারার আয়নিত গ্যাসকে বাইরের দিকে ফোস্কার মত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার কাজে। ফলে তারাটি বহু গুণে বড় হয়ে উঠে। উপরিতল থেকে কিছু কিছু বস্তু উড়ে চলেও যায়। ফুলে যাওয়ায় উপরিতলের উত্তাপ কমে যায়– তাই একে লাল দেখায়। একারণেই এর লাল দৈত্য নামটি এসেছে– বড় আর লাল বলে। মহাকাশে বহু লাল দৈত্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই। নির্দিষ্ট কাল পর পর ঔজ্জ্বল্য বাড়ে কমে এমন সেফেইড তারাকে কী ভাবে বিজ্ঞানীরা তারার দূরত্ব মাপার স্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেল হিসাবে ব্যবহার করেছেন তা আমরা দেখেছি। অনেক সেফেইড তারা এরকম লাল দৈত্য– এদের ফুঁসে ওঠা অংশের নিয়মিত উঠানামা ঔজ্জ্বল্যে পরিবর্তন ঘটার একটি কারণ। আমাদের সূর্য যখন ৫০০ কোটি বছর পর লাল দৈত্য হবে তখন এর আকার এত বড় হবে যে সৌর মন্ডলের ভেতরের দিকের গ্রহ বুধ, শুক্রতো বটেই, আমাদের পৃথিবীও তখন সূর্যের মধ্যে ঢুকে যাবে, অথবা তার একেবারে নিকট আওতায় চলে আসবে। বুঝতেই পারছেন পৃথিবীতে সে অবস্থায় কোন জীব টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

বাইরে উত্তাপ কমে গেলেও লাল দৈত্যের কেন্দ্রে কিন্তু তখন প্রচন্ড চাপের কারণে উত্তাপ বেড়েই চলেছে। সেটি সম্পূর্ণ হিলিয়ামে গড়া। এখানে বলে রাখা ভাল যে হাইড্রোজেনের ফিউশনে তারার মধ্যে হিলিয়াম সৃষ্টি হলেও তার সার্বিক পরিমাণ কিন্তু বিগ্ ব্যাং সৃষ্ট

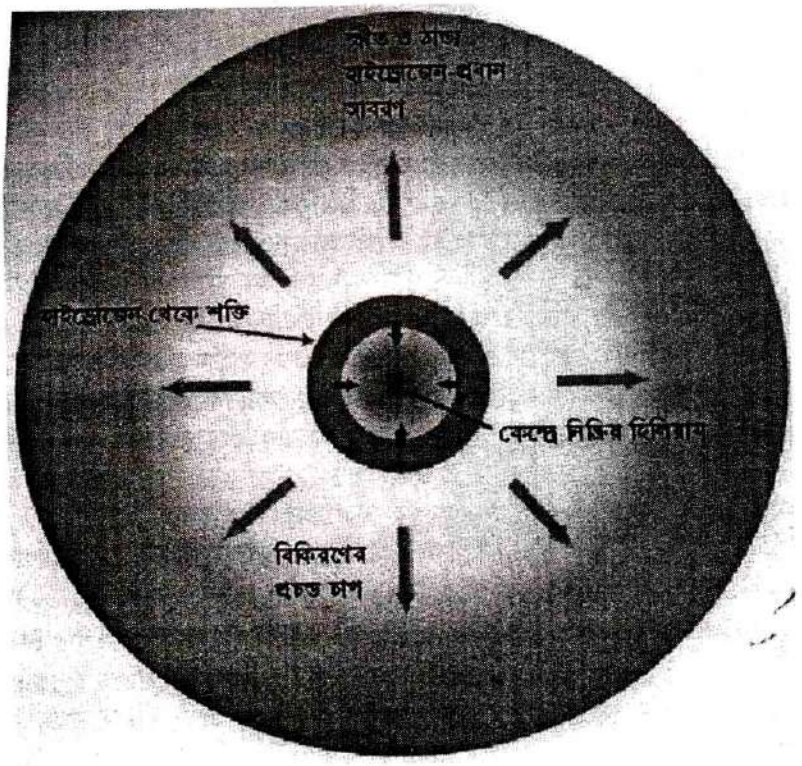

লাল দৈত্য তারা

আদি হিলিয়ামের তুলনায় খুব বেশি নয়। বিগ্ ব্যাং এর মাধ্যমে ঠিক হয়ে যাওয়া হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের অনুপাত কিন্তু তখনো মহাবিশ্বে মোটামুটি একই থেকে যায়। কিন্তু তারার একেবারে কেন্দ্রে সব হাইড্রোজেন হিলিয়াম হয়ে এখন সবই হিলিয়াম, যা প্রচন্ড চাপে আগের চেয়েও অনেক বেশি উত্তপ্ত হয়ে ১০ কোটি ডিগ্রিতে গিয়ে পৌঁছায়। এরকম উত্তাপে পরবর্তী দফা ফিউশন নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া শুরু হতে পারে– এবার হিলিয়াম একীভূত হয়ে কার্বন তৈরির বিক্রিয়া, সেই সঙ্গে কিছু বেরিলিয়াম। এ ভাবে তারার মধ্যেই প্রথম তৈরি হতে পেরেছে নূতন মৌল কার্বন ও বেরিলিয়াম। এই প্রক্রিয়ায় নূতন করে শক্তি তৈরি শুরু হয়েছে, কেন্দ্রের দিকে পতনও ঠেকানো গেছে আবার। ফলে আবার অল্প কিছু সময় স্থিতাবস্থা পায় তারা। কিন্তু এক সময় কেন্দ্রের হিলিয়ামও সব কার্বনে ও বেরিলিয়ামে পরিণত হয়ে যায়, ফিউশন বিক্রিয়া আবার বন্ধ হয়। কাজেই সমস্ত ঘটনার আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ভর যাদের কম সে রকম তারার লাল দৈত্য পর্যায় অবশ্য এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে, যেমন আমাদের সূর্যের ক্ষেত্রে। তাকে চলে যেতে হয় বার্ধক্য কাটাবার পর্যায়ে, এক্ষেত্রে সাদা বামন রূপে, যার কথায় পরে আসবো।

কিন্তু ভর যদি বেশি হয় তাহলে ঐ একই ঘটনা পর্যায়গুলো পর পর আরো বেশ কয়েকবার ঘটবে, ভরের আধিক্যের উপর নির্ভর করে। আর প্রত্যেকবার নূতন করে

কেন্দ্রে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া শুরু হয়ে একটি নূতন আরো ভারী মৌল তৈরি হবে। অবশেষে লাল দৈত্যের পর্যায় শেষ করে তাকেও বার্ধক্যে চলে যেতে হয়।

সব চেয়ে বেশি ভরের তারার ক্ষেত্রেই দেখা যাক পুরো ব্যাপারটি। তারার কেন্দ্রের চাপ যখন উত্তাপকে আরো বাড়ায় তখন নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া আবার শুরু হয়ে তৈরি হয় অক্সিজেন। এর পরের দফায় কেন্দ্রে ৬০ কোটি ডিগ্রি উত্তাপ উঠলে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় কার্বন থেকে নাইট্রোজেনেরও সৃষ্টি হয়। দুটি কার্বনের নিউক্লিয়াসের সম্মিলনে সৃষ্টি হয় হিলিয়াম আর নূতন মৌল নিয়নের। পরে নিয়নের সঙ্গে অক্সিজেনের সম্মিলনে ম্যাগনেশিয়াম। এরপর উত্তাপ দেড়শ কোটি ডিগ্রি উঠলে দুটি অক্সিজেনের সম্মিলনে তৈরি হয় হিলিয়াম আর সিলিকনের। যেই সিলিকনের দ্বারা আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমি গড়া, এভাবে তারার কেন্দ্রেই সৃষ্টি হয়েছে সেটি। আরো এক দফা প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তিতে দুটি সিলিকন নিউক্লিয়াসের সম্মিলনে তৈরি হয় লোহার। লোহাই তারার কেন্দ্রে তৈরি সব চেয়ে ভারী মৌল। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং তারার কেন্দ্রে তৈরি অন্য মৌলগুলি কার্বন, বেরিলিয়াম, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, নিয়ন, ম্যাগনেশিয়াম, সিলিকন, লোহা– এতেই মহাবিশ্বের ৯৯.৯ শতাংশ জানা বস্তুর ভর তৈরি হয়ে গেছে। বাকি ০.১ শতাংশ যে সব আরো ভারি মৌলের গড়া সেগুলো সৃষ্টি হয়েছে তারার দ্বারাই ভিন্ন প্রক্রিয়ায়।

ফিউশন প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত লোহা তৈরির পর একই ধারাবাহিকতায় আরো ভারী মৌল তৈরি হয়না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো লোহাতে গিয়ে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া অনন্য একটি স্থিতি পায়। তারার কেন্দ্রে সিলিকন থেকে লোহা সৃষ্টির পর্যায়টি শেষ হলে আরো চাপ সৃষ্টিতে উত্তাপ আরো বেড়ে ৬০০ কোটি ডিগ্রিতে পৌঁছে এবং নূতন ভাবে ফিউশন বিক্রিয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এ পর্যায়ে অত্যন্ত শক্তিশালী গামা রশ্মি বিকিরণ ঘটে, যার শক্তিতে লোহার নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে ১৩টি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় ও চারটি নিউট্রন নির্গত হয়। আগেকার সব বিক্রিয়ায় শক্তি নির্গত হলেও এই বিক্রিয়াটি কিন্তু শক্তি শোষণকারী। ফলে তারার কেন্দ্রে উত্তাপ দ্রুত কমে যায় এবং নাটকীয়ভাবে কেন্দ্রের অভিমুখে বস্তুর ধস নামে। এর ফলে এমন সব কিছু ঘটে যাতে তারা সুপারনোভা হিসাবে বিস্ফোরিত হবার দিকেই যায়।

বার্ধক্যে তারার নানা দশা

বেশি ভরের তারাগুলোর– যেমন ১০ সূর্য, ৩০ সূর্য এবং আরো ভারী তারাগুলোর অবসান ঘটে সাধারণত একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে। এভাবে বিস্ফোরণরত তারাকে বলা হয় সুপারনোভা। এরকম সুপারনোভা বিস্ফোরণ আমাদের জন্য আকাশে একটি অতিউজ্জ্বল মনে রাখার মতো ঘটনা। ১৯৮৭ সালে এমনি একটি ঘটনা আকাশে প্রায় ৪ মাস ধরে দেখা গিয়েছিল– সেই সুপারনোভাটির নাম দেয়া হয়েছিল ১৯৮৭A। আমাদের থেকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার আলোক-বর্ষ দূরে ঘটলেও এই উজ্জ্বল ঘটনাটি খালি চোখে ভালভাবেই দেখা গেছে এবং এর বিকিরণের ও নিউট্রিনো কণিকার পরিমাপ থেকে সুপারনোভার বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ধারণাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুপারনোভা বিস্ফোরণের সূত্রপাত ঘটে তারার লোহা-প্রধান কেন্দ্রে, উপরের চাপে প্রচন্ড ভাবে ধস নামার ফলে, সেটি আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। এতে ইলেকট্রনগুলো পর্যন্ত

কেন্দ্রের দিকে এত বেশি সংকোচিত হয় যে তা কেন্দ্রের লোহা থেকে সদ্য সৃষ্ট হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের একেবারে ভেতরে গিয়ে ঢুকে। এটি বিরল ব্যাপার, কারণ ইলেকট্রন সাধারণত নিউক্লিয়াসের বাইরেই থাকে। এই ক্ষেত্রে এটি নিউক্লিয়াসে গিয়ে সেখানকার একটি প্রোটনের সঙ্গে একটি ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে একটি নিউট্রন তৈরি করে, এবং সেই সঙ্গে একটি নিউট্রিনো নিঃসরণ করে। নিউট্রিনো পদার্থের সঙ্গে কোন বিক্রিয়া করেনা বলে পুরো তারা ভেদ করে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে একদিকে কেন্দ্রে অসংখ্য নিউট্রন তৈরি হয় এবং অন্যদিকে বিশাল নিউট্রিনো স্রোত তারা থেকে নির্গত হয়। কেন্দ্রে সবকিছু এখন শুধু নিউট্রন রূপে একাকার হয়ে যায় বলে বলা যায় যে তারার পুরো কেন্দ্রটিই যেন অতি ঘন সংবদ্ধ একটি বিশাল সামগ্রিক নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়– যা নিজেই মাত্র ১৮ কিলোমিটার ব্যাসের মধ্যে ছয় সূর্যের সমান ভারী! এর কারণ পরমাণুর প্রায় সব ভর যেই নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত থাকে, এখন সেই নিউক্লিয়াস দিয়েই তারাটি ঠাসা। এরকম পরিস্থিতিতে এর মাধ্যাকর্ষণ এত তীব্র হয়ে পড়ে যে এটি ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়। তারার বাকি অংশের সঙ্গে এই কেন্দ্রীয় ব্ল্যাক হোলের আর কোন সম্পর্ক থাকেনা।

সুপারনোভা বিস্ফোরণ

কিন্তু ব্ল্যাক হোলের সর্বগ্রাসী আকর্ষণ এড়িয়ে দুটি জিনিস প্রচুর পরিমাণে বের হয়ে আসে। এই দুইয়ের মধ্যে নিউট্রিনোর বিষয়টি আমরা দেখেছি। এগুলো অবশ্য প্রায় ভরহীন ও বিক্রিয়াহীন বলে নীরবে চলে যায়। অন্যটি হলো নিউট্রনের সজোরে নির্গত হওয়া। এই নিউট্রন এমন একটি শক্ তরঙ্গের আকারে নির্গত হয় যে তা তারার বাকি অংশকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কার্যত এই বাকি অংশ যেন ধসে পড়তে গিয়ে শক্ত সংকোচিত কেন্দ্রে বাধা পেয়ে উল্টো ফিরে এসে চতুর্দিকে সজোরে বিস্ফোরিত হয়। এ সময় বহির্গামী নিউট্রনগুলো বিস্ফোরণশীল তারার কার্বন, অক্সিজেন, সিলিকন ইত্যাদি এক একটির নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অন্যান্য ভারী মৌলগুলো সৃষ্টি করে। যে সব মৌল তারার কেন্দ্রে এ পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারেনি, এভাবে সুপারনোভার বিস্ফোরণের প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলো সৃষ্টি হয়। এই নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় সৃষ্ট শক্তি শক্- তরঙ্গকে আরো জোরালো করে, যার ফলে তারার পুরো বাইরের অংশটি প্রচন্ড জোরে সেকেন্ডে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। থেকে যায় শুধু কেন্দ্রের অদৃশ্য সেই ব্ল্যাক হোল অংশটি।

সুপারনোভা বিস্ফোরণ এ ভাবে শুধু নূতন মৌল সৃষ্টিই করছেনা, নানা ভাবে সৃষ্ট সকল মৌলকে (আবিস্কৃত স্থায়ী ৯২টি মৌলই) মহাবিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এগুলো তারার ফাঁকে

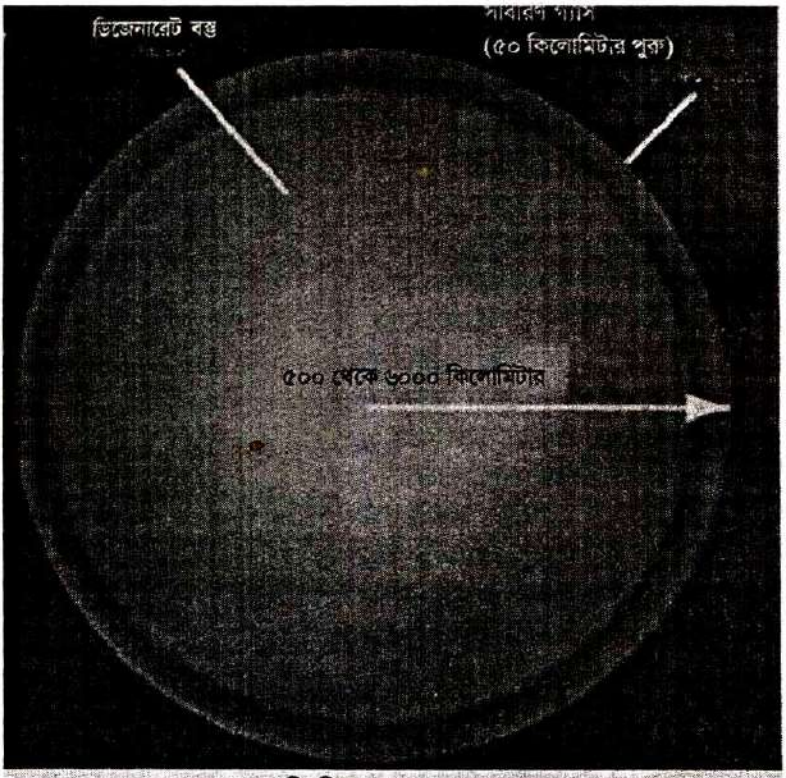

তারার পরিণতি সাদা বামন

ফাঁকের বস্তুরাজির মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিচ্ছে। আর এদের থেকে সৃষ্টি হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের তারা।

কম ভরের তারাগুলো যখন নিউক্লিয়ার জ্বালানী ফুরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তখন শক্তি উৎপাদনের অভাবে পুরো তারাটি কেন্দ্রের উপর অপ্রতিরোধ্য রূপে ধসে পড়ে। তবে এটি অসীমভাবে চলতে পারে না, কারণ ইলেকট্রনগুলো যখন পরস্পরের এত কাছে চলে যায় যে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার নিয়মানুযায়ী তা এর চেয়ে আর কাছে যেতে পারে না। ফলে একটি অতি ছোট অবয়বে সীমাবদ্ধ হয়ে এটি সম্পূর্ণভাবে শক্তি হারানো একটি ছোট গোলকে পরিণত হয়। সূর্যের মত তারা তখন পৃথিবীর মত ছোট আকারে চলে আসে। প্রথম দিকে থেকে যাওয়া উত্তাপের কারণে এটি সাদা দেখায় বলে একে সাদা বামন বলা হয়। বামন কথাটি এর ছোট অবয়বের কারণেই বলা হয়। আসলে দীর্ঘ দিন পর অবশ্য এটি উত্তাপ হারিয়ে ক্রমে হলুদ, লাল, ও খয়েরী বামনে পরিণত হয়। অনেক তারারই শেষ বয়সের পরিণতি এই সাদা বামনে– যেমন হবে আমাদের সূর্যের ক্ষেত্রে। সাদা বামনে পরিণত হবার সময় তারার বাইরের অংশগুলো উদ্বায়ী পাতলা গ্যাসের মত এর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, যাকে আমরা ভেতরের তারার আলোতে পাতলা মেঘের মত নিহারিকা হিসাবে দেখি। কিছু কিছু তারা সুপারনোভা হবার কথা থাকলেও নানা কারণে তা না হয়ে এরকম নিহারিকায় পরিণত হয়।

সুপারনোভা বিস্ফোরণের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অংশটি ব্ল্যাক হোলে পরিণত

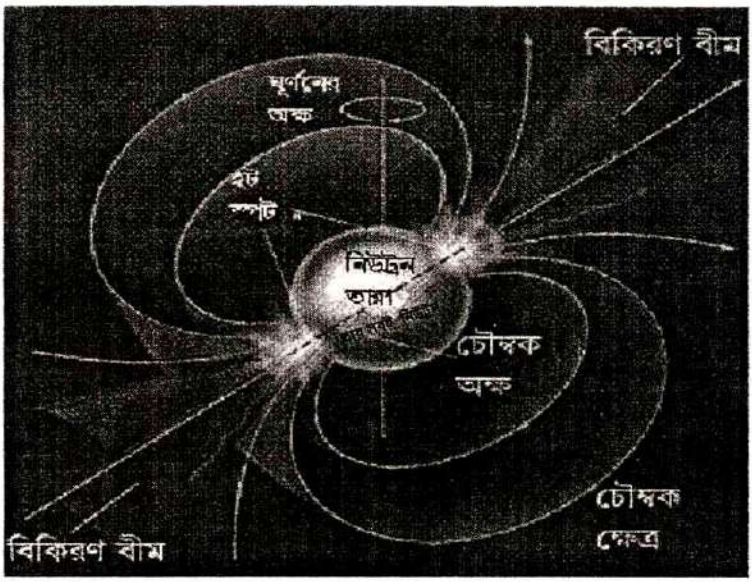

নিউটন তারা : পালসার

না হয়ে শুধু নিউট্রনে গড়া সংকোচিত একটি তারা রূপে থেকে যায়। একে বলা হয় নিউট্রন তারা। এটি ব্ল্যাক হোলের মত অদৃশ্য না হয়ে দৃশ্যমান থাকে। শেষ অবধি নিউট্রন তারার ঘনত্ব হয় অভাবনীয় রকম উচ্চ– এক ঘন সেন্টিমিটারের ভর হয় তিন শত কোটি টন! ১৯৬৭ সালে বৃটেনের একটি রেডিও টেলিস্কোপে একটি অদ্ভূত বিষয় ধরা পড়ে। সেকেন্ডে প্রায় ৩০ বার একেবারে নিয়মিতভাবে একটি রেডিও তরঙ্গ টেলিস্কোপটি অতিক্রম করে যায়। এ যেন বাতিঘরের ঘূর্ণায়মান বাতি থেকে আলো আসার মত– নিয়মিত পৃথিবীর উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। পরে বুঝা গেছে যে এটি কোন নিউট্রন তারার নিয়মিত ঘূর্ণনেরই ফল। নিউট্রন তারার চৌম্বক ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনের গতির ফলেই এই রেডিও তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এ রকম তারার নাম দেয়া হয়েছে পালসার। বার্ধক্যের নানা দশার তারাদের মধ্যে এও এক ধরনের তারা যারা এখনো নিয়মিত সিগন্যাল দিয়ে আমাদের কাছে তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে চলেছে।

কেমন করে জানলাম?

আমরা তারা সম্পর্কে যে খবর সরাসরি পাই তা শুধু এর বাইরের অংশ থেকে বিকিরণের মাধ্যমে– সেই বিকিরণের বর্ণালী বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে। তা হলে এই যে তারার ভেতরের গঠন, কেন্দ্রে সংকোচন, ফিউশন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন, তারার জীবনে নানা পরিবর্তন– লাল দৈত্য ইত্যাদি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সুপারনোভা বা সাদা বামনে পরিণতি– এগুলোর বিস্তারিত প্রক্রিয়া আমরা জানলাম কী করে? এর অনেক খানিই সম্ভব হয়েছে কম্পিউটার মডেলিং এর মাধ্যমে। এ ধরনের নানা পরিস্থিতিতে পদার্থ কী রকম আচরণ করবে তার সর্বাধুনিক জ্ঞান আমাদের রয়েছে পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারগুলোর মাধ্যমে। এদের গাণিতিক ফরমুলাগুলোর ভিত্তিতে গড়ে

মহাবিশ্বের ইতিহাসে অন্ধকার যুগের পর তারার সৃষ্টি

উঠেছে কম্পিউটার মডেলিং। পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত উপাত্তগুলো তাত্ত্বিক ভিত্তির গাণিতিক মডেলে ফিট করেই আমরা তারার জীবন-ইতিহাস উদ্ঘাটন করেছি। আবার এই মডেল থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলোকে সত্যিকার পর্যবেক্ষণে যা দেখি তার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই আমরা নিশ্চিন্ত হই যে মডেলটি নির্ভরযোগ্য, এবং ফলাফলগুলো মোটামুটি নিঁখুত। এই যে আমরা ভবিষ্যৎদ্বাণী করছি এখন থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর পর আমাদের সূর্য লাল দৈত্য তারায় পরিণত হবে এবং পৃথিবীকে গ্রাস করবে– তাও কিন্তু আমরা এই কম্পিউটার মডেলিং এর মাধ্যমেই যথেষ্ট আস্থার সঙ্গে বলতে পারছি। আজকাল বিশেষ করে মহাশূন্য থেকে হাবল স্পেস টেলিস্কোপের কল্যাণে আমরা সুদূর মহাবিশ্বের নূতন তারার জন্ম, এমন কি তার মধ্যে গ্রহমন্ডলির সৃষ্টিকে কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি প্রত্যক্ষও করতে পারছি।

পৃথিবীর জন্ম হলো

সূর্যেরই সমবয়সী সৌর মন্ডল

প্রায় পাঁচশত কোটি বছর আগে একটি নূতন তারা হিসেবে জন্ম হয়েছিল সূর্যের। ছায়াপথ নামক গ্যালাক্সির একটি অতি সাধারণ তারা এটি, ভরের দিক থেকে কম ভারীদের দলেই বলতে হবে একে। সর্বশেষ দৃশ্যমান গ্যালাক্সি সংখ্যার ভিত্তিতে হিসেব করে মহাবিশ্বের গ্যালাক্সির সংখ্যা আমরা পেয়েছি প্রায় ৮০ হাজার কোটি। তারই একটি গ্যালাক্সি ছায়াপথের তারার সংখ্যা সর্বনিম্ন হিসাবেও ১৪ হাজার কোটি। ওগুলোরই একটি হলো সূর্য। কাজেই মহাবিশ্বের মধ্যে এই তারাটি যে কত নগণ্য একটি স্থান দখল করে আছে তা বলাই বাহুল্য। অথচ আমাদের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই মহাবিশ্বে আমাদের যে একমাত্র ঠাঁই সেই পৃথিবীর জন্ম এই সূর্যের সঙ্গে, একই প্রক্রিয়ার মধ্যেই। আর এর সঙ্গে আমাদের জীবন একেবারে ওতোপ্রোতভাবে গ্রথিত– আমাদের শক্তি, আমাদের খাদ্য, আমাদের জলবায়ু, ঋতু, বর্ষ পরিক্রমা সবই।

সূর্যের জন্ম হয়েছিল ছায়াপথ নামক গ্যালাক্সিটির বাইরের দিকের সেই চক্রবাহুর মধ্যে, নূতন তারাগুলো অধিকাংশেরই জন্ম সেখানে। খুব সম্ভব কাছাকাছি স্থানে কোন সুপারনোভার বিস্ফোরণে যে আলোড়ন সেখানকার গ্যাস ও ধূলি-মেঘের মধ্যে হয়েছিল তাই সূর্যের জন্মকে ত্বরান্বিত করেছিল। ঐ যে গ্যাস, ধূলি-মেঘ ইত্যাদি থেকে সূর্য সৃষ্টি হচ্ছিল তা কিন্তু মহাবেগে গ্যালাক্সির মধ্যে পরিক্রমণ করছিল, এখনো যে রকম সূর্য সেখানে পরিক্রমণ করছে। গ্যালাক্সির সব অংশই চক্রাকারে এভাবে ঘুরছে। ছায়াপথের ক্ষেত্রে এর একবার পূর্ণ পরিক্রমণের সময় প্রায় সাড়ে বাইশ কোটি বছর। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণের সময়কে যেমন আমরা বছর বলি, ছায়াপথের এই পরিক্রমণ সময়কে বলা হয় মহাজাগতিক বছর।

সূর্য যখন সৃষ্টি হচ্ছে তখন তার সেই গ্যাস ও ধূলি-মেঘের মধ্যেও একটি মহাজাগতিক ঘূর্ণন ভরবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। সূর্যের কেন্দ্রের চতুর্দিকে তাই এই সব ঘুরপাক খাচ্ছিল। ঐ ঘুরপাক খাওয়া গ্যাস ও ধূলি-মেঘ যা কেন্দ্রের কাছাকাছি সংকোচিত হয়েছে– তা গড়ে তুলছে সূর্যকে, আর যা বাইরের দিকে ছিল তা গড়ে তুলছে সূর্যের গ্রহ মন্ডলকে। কাজেই এদিক থেকে সূর্য আর গ্রহগুলো একই সঙ্গে একই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট।

সংগ্রহ চাকতি

যে ঘূর্ণায়মান গ্যাস ও ধূলি-মেঘের থেকে সূর্য ও গ্রহগুলো সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশ ভর গিয়ে জমেছে মাঝখানে– যা পরিণত হয়েছে সূর্যতে। এটি সম্ভব হয়েছে ঘূর্ণনের কৌণিক ভরবেগের অনেকটা সূর্য থেকে দূরে ঘূর্ণায়মান মেঘের বাইরের দিকের অংশে স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে। কৌণিক ভরবেগের দুটি অংশ– তার ভর এবং তার ঘূর্ণনের বেড় ও গতি। যেহেতু সবকিছুর ঘূর্ণন ভরবেগ সব সময় একই থাকতে হয় তাই ঘূর্ণনের বেড় বাড়িয়ে দিলে এর ঘূর্ণন গতি কমে যায়, বেড় কমিয়ে দিলে গতি বেড়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্য করুন যারা বরফের উপর স্কেটিং করতে গিয়ে বনবন করে ঘুরে, তারা দু হাত দুদিকে প্রসারিত করে দিলে ঘূর্ণনের গতি আপনিই কমে আসে, আবার হাত গুটিয়ে নিলে ঘূর্ণন গতি বেড়ে যায়। সূর্যের সকল ভর যে অসম্ভব দ্রুতবেগে ঘুরে শক্তিতে পরিণত হয়নি তার কারণ এটি তার ঘূর্ণায়মান গ্যাস ও ধূলি-মেঘের আওতাটি তার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছে এভাবে পুরো অবয়বটিতে তার ভরবেগ বন্টন করে দিয়ে সূর্য নিজের ঘূর্ণনকে সীমিত রেখেছে এবং সেভাবে ভর বজায় রেখেছে। আর ওদিকে বাইরের ধূলি মেঘটি একই সমতলে থেকে ক্রমাগত ঘুরেছে একই দিকে একটি চাকতির আকারে। একেই বলা হয় সংগ্রহ চাকতি। এই নামের কারণ হলো ঘুরতে ঘুরতে চাকতিটি ক্রমেই বাইরের থেকে আরো গ্যাস ও ধূলি-কণা সংগ্রহ করেছে এবং তা ক্রমে ভেতরের দিকে নিয়ে এসেছে। এর বেশ খানিকটি অংশ সূর্যের ভরকে সমৃদ্ধ করেছে। বাকিটা বাইরে গ্রহ সৃষ্টি করেছে।

সংগ্রহ চাকতিটি মোটামুটি তিনটি অংশ কল্পনা করা যায়। একেবারে বাইরের দিকের অংশটি সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুরাজিকে বাইরে ছড়িয়েও দিয়েছে। একেবারে ভেতরের অংশ সংগৃহীত বস্তুরাজিকে সূর্যের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার ভর বাড়িয়েছে। আর মাঝামাঝি অংশটির বস্তুরাজি বাইরেও যায়নি, সূর্যের মধ্যেও গিয়ে পড়েনি। এটি নিজের বস্তু বজায় রেখে ঘুরতে থেকেছে, এবং এখানে ক্রমে কণাগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে সংযুক্ত হয়ে সূর্যের থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে ও কাছে এর বিভিন্ন অংশে গ্রহগুলো গড়ে তুলেছে। সংগ্রহ চাকতি যেই সমতলে যে দিকে ঘুরছিল, সূর্যও সেই

বেটা পিকটেরিস তরুণ তারায় সংগ্রহ চাকতি উপগ্রহ থেকে ইনফ্রারেড ইমেজিং

সমতলে সেই দিকে ঘুরছিল, এখনো সেখানেই সেভাবে নিজে অক্ষের উপর ঘুরছে। গ্রহ তৈরি হবার পর আজ অবধি গ্রহগুলোও সেই সমতলেই সেই দিকেই সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করছে। আমাদের চাঁদসহ এসব গ্রহের যে সব উপগ্রহ আছে তারাও একই দিকে ঘুরছে। এমন কি শুক্র এবং ইউরেনাস বাদে বাকি সব গ্রহ নিজের অক্ষের উপর আবর্তনও করছে ঐ একই দিকে (এই দুটি ব্যতিক্রমী গ্রহ খুব সম্ভব কোন বড় উল্কা ইত্যাদির আঘাতে আবর্তন দিক পরিবর্তন করেছে)। এভাবে সব কিছুর একই সমতলে থেকে একই দিকে ঘোরার মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে অতীতে এরা সবই সংগ্রহ চাকতির অংশ ছিল এবং তারই ঘূর্ণন গতি আজও বজায় রেখেছে। গ্রহ সৃষ্টির অন্যান্য যে সব তত্ত্ব আগে প্রচলিত ছিল সেগুলো এই তথ্যগুলোকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন এরকম বাতিল একটি তত্ত্বে বলা হতো যে গ্যালাক্সির মধ্যে পরিক্রমণের সময় সূর্য একটি একটি করে গ্রহগুলোর বস্তুরাজি সংগ্রহ করে নিয়েছে। তেমনটি যদি হতো তা হলে সবগুলো গ্রহের কক্ষপথ একই সমতলে থাকতোনা, তাদের পরিক্রমণের দিকও একই হতোনা।

গ্রহ সৃষ্টির স্বীকৃত এই তত্ত্বটি বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে সম্প্রতি মহাবিশ্বে নূতন কিছু তারার বিস্তারিত ছবি তোলা সম্ভব হওয়াতে। এমনি একটি তারা হলো বেটা পিকটোরিস– উপগ্রহ থেকে তোলা ইনফ্রারেড ছবিতে যাকে ঘিরে সংগ্রহ চাকতিটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাধারণ দৃশ্যমান আলোতে এ ছবি সম্ভব হতো না কারণ মাঝখানে তারাটি বাইরের চাকতির তুলনায় প্রায় এক হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল হওয়াতে তার আলোর মধ্যে চাকতিটি নিস্প্রভ হয়ে যায় বলে দেখা যাবেনা। কিন্তু তারার বিকিরণে দূর-ইনফ্রারেড আলোর অংশ অনেকগুণে কম থাকাতে এর তুলনায় চাকতির তাপ-বিকিরণের মধ্যে ইনফ্রারেডের আধিক্য ছবিতে তাকে স্পষ্ট তুলে ধরেছে। কাজেই তারা সৃষ্টির সময় তার সঙ্গে সংগ্রহ চাকতির উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি।

গ্রহের গড়ে ওঠা

সংগ্রহ চাকতির মোটামুটি মাঝামাঝি অঞ্চলে সেই স্থিতিশীল অঞ্চলে গ্যাস ও ধূলি-মেঘের কণাগুলো পরিক্রমণের সময় পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হচ্ছিল। এরা যেহেতু একই দিকে ঘুরেছে, তাই পরস্পরের সামনাসামনি সংঘর্ষ হয়নি, বরং সংঘর্ষে দুয়ের মধ্যে আপেক্ষিক বেগ কম বলে আপোষে একে অপরের সংলগ্ন হয়ে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে, এবং সেই সংযুক্ত রূপেই পরিক্রমণ চালিয়ে গেছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে ধূলি কণা একত্র হয়ে প্রথমে মিলিমিটার আয়তনের কণা, তারপর ছোট ছোট ডেলা। এরকম গ্রহাণু কিছু এখনো রয়ে গেছে সৌর জগতে সূর্যকে পরিক্রমণরত। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে একই ভাবে বড় কিলোমিটার ব্যাসেরও অসংখ্য গ্রহাণু তৈরি হয়েছে। স্থানে স্থানে গ্রহাণুগুলো নিজেরাও আবার একই প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরো বড় হয়েছে। এগুলোও ক্রমাগত পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে করতে ঘুরেছে। ক্রমে এরা যেটি যত বড় হয়েছে তাদের মাধ্যাকর্ষণের জোরও তত বেড়েছে। ফলে এরপর ছোট যেসব খন্ডের সঙ্গে বড় একটির সংঘর্ষ হয়েছে, সেগুলো অধিক মাধ্যাকর্ষণের ফলে আরো বেশি সংখ্যায় আকৃষ্ট হয়ে বড়টির ভর ও আয়তন বাড়িয়ে তুলেছে। এভাবে যেগুলো

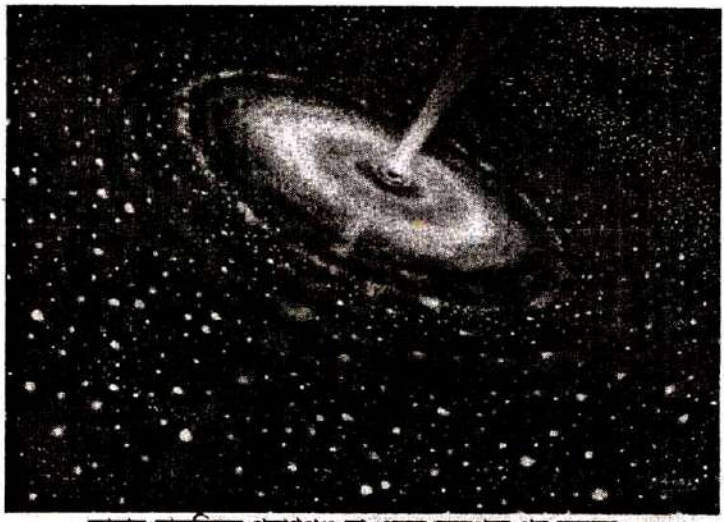

তারার চাকতিতে গ্রহাণুপুঞ্জ যা একত্র হয়েপরে গ্রহ হয়েছে

অপেক্ষাকৃত বড় এ প্রক্রিয়ায় সেগুলোই আরো বড় হয়েছে দ্রুততর– সেগুলোই আজকের গ্রহ হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে অবশ্য এদের সংখ্যা সীমিত হয়ে উঠেছে। ঠোকাঠুকিতে যে সব ছোট খন্ড চাকতির স্বাভাবিক পরিক্রমণ পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে সেগুলো হয় এখান থেকে বের হয়ে গেছে অথবা কোণাকুণি উচ্চ আপেক্ষিক গতিতে সংঘর্ষের কারণে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে গ্রহ নামের উপযুক্ত হবার মত জিনিস শেষ পর্যন্ত মাত্র নয়টিতে পরিণত হয়েছে, তার মধ্যেও অতি সম্প্রতি একটিকে–প্লুটোকে– গ্রহ পদ থেকে খারিজ করে দেবার কথা বলা হয়েছে, এটি গ্রহ হবার সব শর্ত পূরণ করছে না বলে।

এভাবে সৃষ্ট যে সব গ্রহ সূর্য থেকে অনেক দূরে ছিল– নেপচুন, ইউরেনাস, বৃহস্পতি, শনি– সেগুলো সূর্যের উত্তাপ তেমন বেশি পায়নি বলে তাদের গ্যাসীয় অংশটি গ্রহের সঙ্গেই রয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে– যে সব বস্তু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গ্রহে পরিণত হয়েছিল আদিতে তার অধিকাংশই ছিল গ্যাস, কঠিন ধূলি কণা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। এই গ্যাস থেকে যাওয়ায় বাইরের দিকের এই বড় বড় গ্রহগুলো প্রায় সর্বাংশেই এখন গ্যাসে গড়া গ্রহ। কিন্তু যে সব গ্রহ সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছে– বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল– সেখানে সূর্যের উত্তাপ এমন বেশি গিয়েছে যে তাতে উত্তপ্ত হয়ে সেই আদি হালকা গ্যাস সব উবে চলে গেছে। ফলে এসব গ্রহ হয়ে পড়েছে কঠিন শিলার গ্রহ। শুরুতে এসব কঠিন শিলার গ্রহগুলো কিন্তু মোটেও শান্তিতে ছিলনা। তখনো সংগ্রহ চাকতিতে ছোট ডেলা, গ্রহাণু, বড় হয়ে উঠা গ্রহ-সদৃশদের সংখ্যা অনেক। গ্রহের উচ্চ মাধ্যাকর্ষণে এরা প্রচন্ড বেগে গ্রহগুলোর উপর এসে পড়ছিল, সংঘর্ষ করছিল। এসব সংঘর্ষ গ্রহগুলোর উপরিভাগকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করে তুলে এখানকার ধাতব অংশকে গলিয়ে ফেলেছিল। লোহা ইত্যাদি ভারী ধাতুগুলো এভাবে গলে গিয়ে গ্রহের কেন্দ্রের দিকে চলে গেছে। আমাদের গ্রহটিও এভাবে গড়ে উঠেছিল আজকের পৃথিবী হওয়ার পথে। কিন্তু সেই প্রথম অবস্থায় তখনো তার আরো অনেক আঘাত সহ্য করার বাকি। তাছাড়া হালকা গ্যাস চলে গেলেও ভেতর থেকে আরো গ্যাস বের হয়ে তার বায়ুমন্ডল গঠন করছিল, যেটি অবশ্য

আজকের বায়ুমন্ডলের মতো ছিলনা। এ কাজে উল্কা ও ধূমকেতুর বহন করে আনা নানা বস্তুও সহায়ক হয়েছে।

গ্রহাণুপুঞ্জ, উল্কা, ধূমকেতু

বুধ থেকে নেপচুন ও প্লুটো পর্যন্ত সূর্য থেকে নানা দূরত্বে গ্রহগুলো সূর্যেরই সমবয়সী। এরমধ্যে একটি কক্ষপথ আছে যেখানে পরিক্রমণশীলরা এখনো গ্রহাণু হয়েই রয়েছে, কখনোই গ্রহ হয়ে উঠতে পারেনি। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে এই কক্ষপথে অসংখ্য এরকম গ্রহাণুপুঞ্জ একটি বলয়ের আকারে পরিক্রমণ করছে। খুব সম্ভব বৃহস্পতির প্রবল মাধ্যাকর্ষণের কিছু বিঘ্ন সৃষ্টিকারী প্রভাবের কারণেই এরা গ্রহ হিসাবে দানা বাঁধতে পারেনি।

সৌরজগতের শৈশবে, প্রায় একশত কোটি বছর বয়স পর্যন্ত, গ্রহগুলো ছাড়াও এখানটা ছোট বড় অসংখ্য খন্ড ও ভগ্নাংশে ভরপুর ছিল। কাজেই তখনকার ইতিহাস তাদের সংঘর্ষের ইতিহাস। তারপর এগুলোর সংখ্যা দ্রুত কমে গেছে বটে কিন্তু একেবারে শেষ হয়নি, এখনো শেষ হয়নি। এগুলোর মধ্যে যেগুলো সৌরজগতে ইতস্তত বিচরণ করেছে তাদেরকেই আমরা উল্কা বলি। গ্রহ সৃষ্টির আদি বস্তু থেকে একই ভাবে একই সময়ে এদেরও জন্ম। খুব ছোট থেকে যথেষ্ট বড় এরকম উল্কার সঙ্গে সেই সংঘর্ষের যুগে তো বটেই, তারপরও পৃথিবীর প্রায়শ সংঘর্ষ ঘটেছে। পৃথিবীর গঠনে, এমন কি পৃথিবীতে প্রাণের আর্বিভাবে এবং তারপর এখানে জীবের বড় বড় গণবিলুপ্তিতে উল্কাপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, যে কাহিনী আমরা অন্যত্র আলোচনা করবো। সেই সময় পার হয়ে এলেও, উল্কার সংখ্যা অনেক কমে গেলেও, এখনো উল্কাপাত কিন্তু নিয়মিত হচ্ছে, যদিও তা ক্ষতিকর হবার মত নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এক হিসাব মতো খুব ছোট ডেলার আকারে গণ্য হবার মত উল্কাপাত পৃথিবীর উপর প্রতিদিন অন্তত ১৯ হাজার বার ঘটছে। যথেষ্ট ক্ষতি করার মত বড় সাইজের উল্কাপাতের সম্ভাবনা এখন কম হলেও একেবারে নাই তা বলা যাবেনা।

গ্রহ সৃষ্টির সেই আদি যুগে কিছু কিছু বস্তু ধূলি-কণা ও অপেক্ষাকৃত বড় ডেলা রূপে জমাট বেঁধে তার উপর প্রচুর বরফ ও কঠিন কার্বন- ডাই-অক্সাইড জমেছিল। তাছাড়া এদের অনেকগুলোতে ফর্মালডিহাইড, এমোনিয়া, কার্বন-মনো-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসও যথেষ্ট ছিল যেগুলো প্রাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ডেলাগুলোর আয়তন ছিল এক সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে দশ বিশ কিলোমিটারেরও বেশি। এদের মধ্যে কোন কোনটি সূর্যের চারিদিকে খুবই লম্বাটে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ রচনা করে পরিক্রমণ করছিল। এদের কিছু কিছু এখনো আছে। কক্ষপথে সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছে আসলে তাদের বরফ গ্যাসে পরিণত হয়ে কেন্দ্র থেকে দীর্ঘ লেজের আকারে দেখা দেয় যা সূর্যের আকর্ষণে সূর্যের অভিমূখে থাকে। ঐ লেজ বিশিষ্ট আকৃতিতেই এরা আমাদের পরিচিত ও বহুল আলোচিত ধূমকেতু। সৌরজগতের সেই প্রাথমিক যুগে ধূমকেতুর সংখ্যাও ছিল বেশি এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষও হতো প্রচুর। একটি তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবী তার পানির অধিকাংশ পেয়েছে এই ধূমকেতুর সংঘর্ষের মাধ্যমে। তাছাড়া প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থের অধিকাংশও খুব সম্ভব আমরা ধূমকেতুর সংঘর্ষের মাধ্যমেই

পৃথিবীতে পেয়েছি। পরিচিত ধূমকেতুগুলোর কোন কোনটি অনেক বছর পর পর কক্ষ পরিক্রমণে সূর্যের কাছে (এবং সেই সুবাদে পৃথিবীর কাছে) আসলে আমরা কিছুদিনের জন্য তাদের দেখতে পাই। এভাবে বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতু আসে ৭৭ বছর পর পর।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পুরো সৌরজগত– সূর্য, গ্রহগুলো, গ্রহাণু, উল্কা, ধূমকেতু সব কিছু একই বস্তুরাজি থেকে প্রায় একই সঙ্গে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল। তাই তাদের বস্তু সম্ভারে অনেক সাদৃশ্য রয়ে গেছে। আসলে পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলার সন্ধান নিতে এখনো আমাদেরকে উল্কাপাতে আসা প্রাচীন শিলাখন্ডের সন্ধান নিতে হয়– কারণ ঐ সবের মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের সুদূর অতীতের কাহিনী। আজকের পৃথিবীর অবয়ব তৈরি হয়েছে তার শৈশবের সেই সংঘর্ষের যুগে– উল্কা আর ধূমকেতুর আগমণগুলোর মাধ্যমে। কিন্তু সব চেয়ে প্রচন্ড এবং বড় প্রভাব রাখার মত সংঘর্ষটি ঘটেছিল একটি স্মরণীয় ঘটনার মাধ্যমে, যার ফলে জন্ম হয়েছিল আমাদের চাঁদের। আরো নানা গ্রহের ছোটখাট উপগ্রহ রয়েছে বটে, কিন্তু চাঁদ একেবারেই অনন্য। এর আয়তন পৃথিবীর সঙ্গে এত তুলনীয় এবং এদের পরস্পরের উপর প্রভাব এত বেশি যে পৃথিবী আর চাঁদকে একত্রে একটি জোড়াগ্রহ বল্‌লে অত্যুক্তি হয়না।

পৃথিবীর দোসর হয়ে চাঁদের জন্ম

পৃথিবীর সৃষ্টিকালে কখন কী ভাবে চাঁদের জন্ম হলো তা এখন আমরা জানি। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে প্রায় নিশ্চিতভাবে এটি জানতে পারার কারণ প্রধানত দুটি– কম্পিউটার সিম্যুলেশনের মাধ্যমে ব্যাপারগুলো বুঝতে পারা, আর এপলো মহাশূন্যচারীরা চাঁদের যে সব শিলা নিয়ে এসেছেন সেগুলোর পরীক্ষা। এতে বুঝা যাচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টি প্রক্রিয়ার শেষের দিকে এসে প্রায় মঙ্গলের সমান আয়তনের একটি গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষে চাঁদের জন্ম। ঐ গ্রহ ও পৃথিবীর দেহাবশেষ নিয়েই আজকের চাঁদ ও পৃথিবী। কিন্তু সেই সংঘর্ষ কিছু কঠিন অংশ ভেঙ্গে নেবার ব্যাপার ছিলনা। সংঘর্ষের উত্তাপে ঐ আগন্তুক গ্রহ পৃথিবীর বিশাল উপরিভাগ তরলিত করে তাতে সজোরে ডুবে নিজেও তরলিত হয়েছিল। এই মিশ্র তরলের বেশ কিছু অংশ ছলাৎ ছিটকে গিয়েই চাঁদের সৃষ্টি।

মঙ্গল-সাইজের ঐ গ্রহটা পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষ করেছিল কিছুটা তেরচা ভাবে। তাই অত্যন্ত সজোর সংঘর্ষ হলেও তা পৃথিবীর কেন্দ্র অঞ্চলে না এসে কোণাকুণি এগিয়েছে। সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট প্রচন্ড উত্তাপ তাই পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বাইরে থাকা স্তরগুলোর শিলার অনেক খানি তরলিত করেছে, এবং আগন্তুক গ্রহটিও তরলিত হয়ে উভয়ে একাকার হয়েছে। সংঘর্ষের মিনিট খানেকের মধ্যেই তা ঘটেছে। এই মিশ্র তরলিত অংশের বেশ খানিকটা ছিটকে গিয়ে আলাদা হয়েছে। আগেই পৃথিবীর লোহা প্রভৃতি ভারী ধাতু তার কেন্দ্রের দিকে গিয়ে সেখানে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই তরলিত ছিটকে যাওয়া ঐ অংশে লোহা থাকার কোন সুযোগ ছিল না। আগন্তুক গ্রহটিতে যদিও বা কোন লোহা থেকে থাকতো তাও তার কেন্দ্রের সঙ্গে পৃথিবীতেই থেকে গেছে– ছিটকে যাওয়া অংশে যায়নি। মহাশূন্যচারীদের আনা চাঁদের শিলায় বাস্তবেও লোহার সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত সহজে বাষ্পীভূত হয় এমন কোন উদ্বায়ী বস্তুও চাঁদে পাওয়া যায়নি।

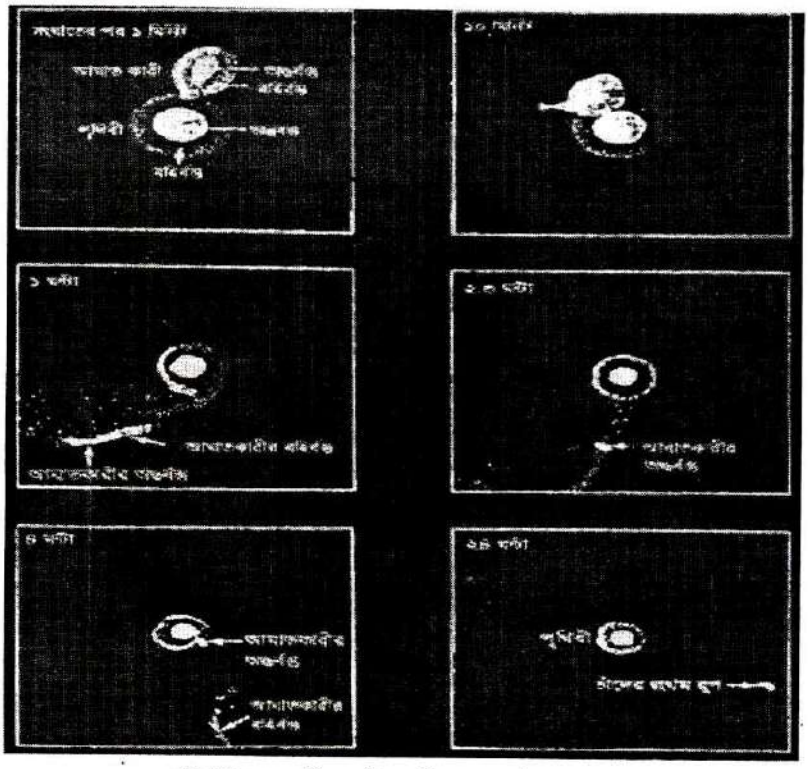

কম্পিউটার মডেলিং এ চাঁদ সৃষ্টির প্রথম ঘটনাগুলো

চাঁদ সৃষ্টির এই মডেল সেটিও চমৎকার ব্যাখ্যা করে। ঐ প্রচন্ড উত্তাপে তরলিত অবস্থায় উদ্বায়ী বস্তুগুলো উড়ে চলে যাওয়াই স্বাভাবিক– চাঁদের অংশ হবার সুযোগ পায়নি। চাঁদের শিলার বিশ্লেষণ থেকে যা জানা যাচ্ছে তাতে ভাবখানা এমন যে পৃথিবীর উপরের অংশের সব কিছুকে যথেষ্ট উত্তাপে ফুটিয়ে রান্না করে বায়বীয় সব জিনিষগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে, লোহার মত ভারী জিনিসগুলোকে পৃথিবীতে অক্ষত রেখে বাকি অংশগুলো দিয়ে চাঁদ তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে যে আগন্তুক গ্রহটি পৃথিবীর সঙ্গে তেরচাভাবে সংঘর্ষ করতে এসেছিল তাকে মোটামুটি হজম করে ফেলা হয়েছে কিছুটা পৃথিবীতে, বাকিটা চাঁদে। অতি সম্প্রতি ২০০৯ সালে অবশ্য চাঁদের কিছুটা গভীরে বরফের আবিষ্কার সব উদ্বায়ী বস্তু চলে যাওয়ার তত্ত্বে কিছুটা বাধ সেধেছে। মার্কিন মহাশূন্য সংস্থা নাসা সব সময় ছায়াতে থাকা চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের উপর একটি মহাশূন্য-মিসাইল প্রবল বেগে আঘাত করিয়ে তার ফলে কিছুটা গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত ধূলি ও গ্যাসের মধ্যে চার মিনিট পর একটি মহাশূন্য যান নিয়ে গেছে। সেটির যন্ত্রপাতিতে ঐ উৎক্ষিপ্ত বস্তুগুলোর মধ্যে বরফের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

চাঁদের গর্ভে পানির উৎস গবেষণা সাপেক্ষ হলেও, তরলিত অবস্থায় ছিটকে গিয়ে চাঁদ সৃষ্টির মডেলটি তাতে চ্যালেঞ্জের সম্মূখীন হয়নি।

শুরুতে ছিটকে যাওয়া অংশগুলো ছিটিয়ে থাকা নানা খন্ডে পৃথিবীর চারিদিকে একটি বলয়ের আকারে ঘোরা আরম্ভ করেছিল। কিন্তু এগুলো ধীরে ধীরে যেমন ঠান্ডা হয়ে কঠিন

হয়েছে তেমনি আবর্তনরত অবস্থাতেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রমে বড় ও অখন্ড চাঁদের সৃষ্টি করেছে। সূর্যের চারিদিকে আবর্তনরত অবস্থাতে নানা খন্ড একত্র হয়ে গ্রহগুলো যেমন ভাবে সৃষ্টি হয়েছে– এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। কিন্তু চাঁদের সৃষ্টি হবার সংঘর্ষটি পৃথিবীর আচরণের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখে গেছে। কোণাকুণি সংঘর্ষটি পৃথিবীকে দ্রুত বন বন করে ঘুরিয়ে দিয়ে গেছে– সেই ঘোরাতেই পৃথিবী আজো ঘুরে ২৪ ঘণ্টায় দিন রাত করছে। তাছাড়া ঐ কোণাকুণি সংঘর্ষের কারণেই খুব সম্ভব পৃথিবী তার ঘূর্ণন অক্ষের তেরচা অবস্থানটি পেয়েছে কক্ষের সমতলের সঙ্গে। এরই ফলে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পরিমাণে ঋতু পরিবর্তন ঘটছে। চারশত কোটি বছর পরও ঐ সংঘর্ষের কথা এক দিনের জন্যও আমাদেরকে ভুলতে দিচ্ছেনা– আকাশে চাঁদের উপস্থিতি, দিন রাতের ক্রমাবর্তন এবং ঋতু পরিবর্তন।

এই মডেলের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ এখন অকাট্য। কম্পিউটার সিম্যুলেশনে এর সব ফলশ্রুতি প্রমাণিত হয়েছে এবং আজকের বিভিন্ন মাপজোকের সঙ্গে তা মিলে যাচ্ছে। চন্দ্র শিলার বিশ্লেষণও মোটামুটি[৯] সেই একই কথা বলে।

অন্যান্য তারায় গ্রহের অস্তিত্ব

আমরা দেখেছি আমাদের সূর্য অসংখ্য গ্যালাক্সির অসংখ্য তারার মধ্যে একটি মামুলি তারা। কাজেই এর গ্রহ-উপগ্রহ থাকতে পারলে অন্যান্য অসংখ্য তারার ক্ষেত্রে সেটি না থাকার কোন কারণ নেই। কিন্তু যদিও মহাকাশে নূতন তারার সৃষ্টির এবং তাতে সংগ্রহ চাকতির ছবি নেয়া সম্ভব হয়েছে, অন্য তারার গ্রহের ক্ষেত্রে তেমনটি সম্ভব হয়নি এখনো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের কৌতুহল প্রচন্ড। কারণ প্রাণের অস্থিত্ব সম্ভব পৃথিবীর মত এ রকম কোন জায়গা খুঁজে পেতে হলে অন্য তারার কোন গ্রহ-উপগ্রহেই তা খুঁজে পেতে হবে। ওরকম প্রাণের আবিষ্কার এবং সেখানকার সম্ভাব্য বুদ্ধিমান প্রাণির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিজ্ঞানীরা প্রচুর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন কি খুঁজে পেলে এমন কোন জায়গায় বসত স্থাপনের চিন্তাও হচ্ছে। কিন্তু সবার আগে সে রকম গ্রহকে খুঁজে পেতে হবে।

নব্বই এর দশকের শুরুর দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটি পালসারের থেকে আসা নিয়মিত রেডিও সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সিতে কিছু পরিবর্তন খুঁজে পান। ডপলার পদ্ধতিতে এই পরিবর্তন থেকে তাঁরা পালসারটির গতিবেগের পরিবর্তনও বের করেন। তাঁদের মাপজোকে বুঝা গেল যে ঐ পালসার তারাটির চারিদিকে আবর্তনশীল দুটি গ্রহের কারণেই গতির এই পরিবর্তনটি সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রহের আবর্তনের ফলে আমাদের সঙ্গে ঐ তারার আপেক্ষিক বেগ নিয়মিত সময় পরপর সামান্য বাড়ে আর সামান্য কমে, যা সেকেন্ডে ৫০-৬০ মিটারের বেশি নয়। ১৯৯৫ সালের দিকে আমাদের কাছাকাছি আরো প্রায় শ'খানেক তারার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতিতে এরকম গ্রহের উপস্থিতি টের পাওয়া গেছে। হিসাবে দেখা গেছে যে এভাবে উদ্ঘাটিত গ্রহগুলো আয়তনে বেশ বড় – বৃহস্পতি গ্রহের কাছাকাছি। ডপলার পদ্ধতিতে খুব সামান্য বেগ হ্রাস বৃদ্ধি পরিমাপ করতে পারার মাধ্যমেই এই উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে।

পরিমাপের সূক্ষ্মতার বর্তমান সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাদের থেকে অল্প কিছু আলোক-বর্ষ দূরের ক্ষেত্রে শুধু এই উদ্ঘাটন সম্ভব হচ্ছে, তাও শুধু বৃহস্পতির সাইজের গ্রহের ক্ষেত্রে। আসলে গ্রহ আছে এমন তারার সংখ্যা অসংখ্য হওয়ার কথা– আর গ্রহের আয়তনও অধিকাংশই এর চেয়ে অনেক ছোট হবার কথা। এক হিসাবে আন্দাজ করা হচ্ছে যে মহাবিশ্বে প্রতি পাঁচটি তারার একটিতেই গ্রহমন্ডলী থাকা স্বাভাবিক। আর এদের অনেকগুলো আমাদের জানা প্রাণি-বৈশিষ্ট্যের জন্য অনুকূল হবে, তাও বিচিত্র নয়।

প্রথম মুহূর্তগুলোতে

অপ্রিয় অসীম

মহাবিশ্বের বয়সের বড় অংশ অতিক্রম করে আমরা পৃথিবীর জন্ম পর্যন্ত চলে এসেছি। এটি আমরা করেছি দ্রুত নিজেদের ইতিহাসটি দেখে ফেলতে। বিগ্ ব্যাং এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি, গ্যালাক্সি ও তারার জন্ম, আমাদের পৃথিবীর জন্ম– তবেই তো সেখানে সৃষ্টি হয়েছে প্রাণ, আসতে পেরেছি আমরা। দ্রুত এই কাহিনীতে চলে যাবার জন্য সৃষ্টির একেবারে প্রথম মুহূর্তগুলোর কথা আমরা বেশি বলিনি কারণ ঐ মুহূর্তগুলোর ব্যাখ্যা এখনো বেশ খানিকটা অনিশ্চিত এবং জটিলতর। এখানে রয়েছে বেশ কিছু কঠিন প্রশ্ন, যার উত্তর এখনো তাত্ত্বিক পর্যায়ে রয়েছে। সরাসরি পরীক্ষণ সাক্ষ্যের মাধ্যমে এই উত্তরগুলোকে এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। তাই শুরুতেই সেই সব কঠিন প্রশ্ন মোকাবেলা না করে আমরা প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলো নিয়ে এগিয়ে গেছি। এখন একেবারে গোড়ায় আবার ফিরে গিয়ে ঐ প্রশ্নগুলো দেখা যাক। এদের মধ্যে রয়েছে কতগুলো গুরুতর সমস্যা যা দূর করতে না পারলে প্রস্তাবিত ব্যাখ্যাগুলো এগুতে পারেনা। এমনি একটি সমস্যা হলো অপ্রিয় অসীম যা 'সিঙ্গুলারিটি সমস্যা' বলেই বিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত।

আমাদের কাহিনী আমরা কিছুটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পেরেছি মহাবিশ্বের মিলিসেকেন্ডের মত বয়সের পর থেকে। এর আগের যে পরিস্থিতি, সেরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন আজকের পদার্থবিদ্যা বাস্তব ক্ষেত্রে কখনো হয়নি। আজকের মহাবিশ্বের যে অবস্থা, এর যে ঘনত্ব ও উত্তাপ, তার থেকে যৌক্তিক ভাবে ক্রমাগত পেছনে গিয়ে আমরা মহাবিশ্বের ইতিহাস দেখেছি। আগে এর ঘনত্ব বেশি ছিল, উত্তাপও বেশি ছিল। এভাবে পেছনের দিকে গিয়ে ঐ মিলিসেকেন্ড বয়সে পৌঁছে আমরা দেখি উত্তাপ প্রায় $১০^{২৮}$ ডিগ্রির মত অর্থাৎ একের পর ২৮টি শূন্য দিলে যে সংখ্যাটি দাঁড়ায় তত ডিগ্রি! এমন উত্তাপ কোন পরীক্ষণে সৃষ্টি আমরা করতে পারিনি। তা ছাড়া পেছনের দিকে যেতে যেতে মহাবিশ্বের আকার ছোট হতে হতে এবং ঘনত্ব বাড়তে বাড়তে একেবারে শূন্য আয়তন অর্থাৎ বিন্দু অবস্থায় পৌঁছার কথা। এমন অবস্থায় ঘনত্ব নির্ণয় করতে হলে সেই বিন্দু-বিশ্বের ভরকে শূন্য আয়তন দিয়ে ভাগ করতে হয়। কোন কিছুকেই শূন্য দিয়ে ভাগ করাটি একটি প্রচন্ড গাণিতিক সমস্যার সৃষ্টি করে– যাকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি। এক্ষেত্রে এমন অবস্থাকে বলতে হয় অসীম ঘনত্ব– যে রকম কথা বিজ্ঞানীরা মোটেই পছন্দ করেন না, কারণ তাকে কোন বাস্তবতার সঙ্গে মেলানো কঠিন হয়। তাই বিজ্ঞানীরা যথাসাধ্য

সিঙ্গুলারিটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা এটা এড়ানো প্রয়োজন মনে করছেন কারণ সিঙ্গুলারিটি মহাবিশ্বের ইতিহাসের জন্য একটি 'কিনারার' (edge) সৃষ্টি করে যার আগের ও পরের মধ্যে কোন সাবলীলতা থাকেনা। একে এড়াবার একটি প্রচেষ্টা হলো কালের হিসেবে ক্রমাগত পেছনের দিকে গেলে মহাবিশ্বকে কখনোই একেবারে বিন্দু অবস্থাতে পাবনা এমন ধরে নেয়া। এই তত্ত্বে বিন্দু অবস্থার কাছাকাছি থেকেই বিকর্ষণ বলগুলোর কারণে তা বিস্ফারিত হতে আরম্ভ করেছে। ঐ অবস্থানে ঘনীভূত মহাবিশ্বের প্রচন্ড চাপ ভরে পরিণত হয়ে ঐ বিকর্ষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। সিঙ্গুলারিটি এড়াবার আর একটি কৌশল হলো মহাবিশ্বের প্রসারণের মধ্যে সামান্য একটুকু অপ্রতিসাম্য রয়ে গেছে এমন মনে করা, যা তাকে কখনোই একেবারে জ্যামিতিক বিন্দু অবস্থায় থাকতে দেয় না। একটি প্রসারমান গোলক অতীতে একেবারে বিন্দু ছিল এমন অবস্থা হতে পারে যদি গোলকটা একেবারে সবদিকে নিখুঁত প্রতিসম হয়, নইলে তা হবেনা।

সিঙ্গুলারিটির সমস্যাটি থেকে রক্ষা পাওয়ার আর একটি উপায় হলো মহাবিশ্বের বয়সের প্রথম মিলিসেকেন্ডের চেয়েও অনেক অনেক আগের বিন্দুবৎ অবস্থার উপর আজকের মহাবিশ্বের পরিস্থিতি নির্ভর করছেনা এমনটি ধরে নেয়া। হাজার হলেও সিঙ্গুলারিটি সমস্যাটি আসছেই তো আজকের পরিস্থিতি থেকে ক্রমাগত পেছনের দিকে গিয়ে আমরা সেই মুহূর্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি বলেই। সেই মুহূর্তের পর পর এমন কিছু যদি ঘটে থাকে যাতে পরবর্তী ইতিহাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘটানোর কোন উপায় থাকেনা– তা হলে হয়তো সিঙ্গুলারিটির মধ্যে আমাদের যেতেই হয় না। আজকের বিজ্ঞানীরা এই পথটিই প্রধানত অনুসরণ করছেন– মহাস্ফীতি (inflation) নামের একটি তত্ত্বের মাধ্যমে, যা একসঙ্গে অনেকগুলো সমস্যা সমাধান করে দেয়। এটি আমরা কিছু পরে বুঝার চেষ্টা করবো।

ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তমের হাত ধরাধরি

মহাবিশ্বের সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তগুলোকে বুঝতে হলে যে তত্ত্বের অবতারণা করতে হয় সেগুলো কিন্তু মূলত কণিকাবিদ্যার। প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম মৌলিক কণিকাগুলোকে বুঝার জন্য যে প্রচেষ্টা তার সঙ্গে এখানে একাকার হয়ে গেছে পুরো মহাবিশ্বের অতীতকে বুঝার প্রচেষ্টাটি। মহাবিশ্বের শুরুর মুহূর্তগুলোর অতি প্রচন্ড উত্তাপ ও ঘনত্বের যে চরম অবস্থা সে রকম পরিস্থিতিতে পদার্থবিদ্যা কী দাঁড়ায় সাম্প্রতিক কালে তার তত্ত্ব দিতে সমর্থ হয়েছেন কণিকাবিদ্যায় গবেষণারত পদার্থবিদরা। কাজেই আমাদের অনুধাবনের সীমা এখন সেখানেও প্রসারিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। এখানে কণিকাবিদ্যার প্রসঙ্গ টেনে আমাদেরকে স্মরণ করতে হবে যে দুনিয়ার সব বস্তুর নানা বিক্রিয়াগুলো ঘটে চারটি ভিন্ন ধরনের বলকে আশ্রয় করে। এগুলো হলো মাধ্যাকর্ষণ বল, বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল, সবল নিউক্লিয়ার বল এবং দুর্বল নিউক্লিয়ার বল। এর মধ্যে প্রথম দুটি আমাদের সুপরিচিত। মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে সব বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, যেমন সূর্য ও পৃথিবী পরস্পরকে, এবং পৃথিবী ও আমরা পরস্পরকে। বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের কারণে পরমাণুতে নিউক্লিয়াস আর তার বাইরের ইলেক্ট্রনগুলো পরস্পর সংলগ্ন থাকছে যার ফলে পরমাণু

বহু কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কণিকা ত্বরকের আয়োজন

এবং সকল বস্তু সম্ভব হয়েছে। আমাদের পরিচিত রাসায়নিক ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক জগতেরও অনেক কিছু এর ফলেই ঘটছে। সবল নিউক্লিয়ার বল পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনগুলোকে একত্রে রাখে যাকে উন্মুক্ত করে আমরা পাই নিউক্লিয়ার বোমার অথবা নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ জনন কেন্দ্রের শক্তি; হাইড্রোজেন বোমায় অথবা তারার কেন্দ্রে শক্তি উৎপাদনের (সূর্যের উত্তাপও আলো হিসাবে যা আমরা নিত্য পাচ্ছি)। নিউক্লিয়ার দুর্বল বলটি আমাদের অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত হলেও তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে বেটা রশ্মি নির্গমণের ক্ষেত্রে এর সক্রিয়তা পদার্থবিদগণ অনেকদিন থেকে জানেন। পদার্থবিদদের একটি বড় প্রচেষ্টা হলো এই সব রকমের বলগুলোকে যথাসম্ভব একই তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা– সব বলের একটি একীভূত তত্ত্ব তাঁদের বহুদিনের স্বপ্ন, কারণ এদের মধ্যে প্রতিসাম্যে এবং মৌলিক পর্যায়ে একটিমাত্র অনন্য (সুপার) বলে তাদের একাকার হওয়াটাই পদার্থবিদ্যার দিক থেকে কাম্য ও সুশোভন। ১৯৬৭ সালে দেয়া আব্দুস সালাম ও ভাইনবার্গের তত্ত্বের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল ও নিউক্লিয়ার দুর্বল বলের একীভূত করণ সম্ভব হয়েছে। ইলেকট্রো-উইক তত্ত্ব নামে পরিচিত এই তত্ত্ব সালাম ও ভাইনবার্গ যখন পৃথকভাবে প্রথম আবিষ্কার করেছেন, তা পরীক্ষণে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত পুরোপুরি স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু ঐ তত্ত্ব সঠিক হলে এর দ্বারা পূর্বাভাষকৃত দুটি বোসন কণিকার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার কথা। কিন্তু কণিকাকে অনেক উচ্চ শক্তিতে নিয়ে না গেলে সেটি পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। ইউরোপীয় গবেষণা কেন্দ্র সার্নের (CERN) কণিকা ত্বরকে প্রচন্ড বেগে কণিকাকে নিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়ে এ রকম উচ্চ শক্তির অবস্থাতে পূর্বাভাষকৃত বোসনকে খুঁজে পাওয়া গেছে। এভাবে সালাম-ভাইনবার্গ তত্ত্ব সপ্রমাণিত হওয়া ছিল পদার্থবিদ্যার একটি বড় সাফল্য, এবং এ তত্ত্বের জন্য তাঁরা উভয়ে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আব্দুস সালাম পাকিস্তানের বিজ্ঞানী, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন আপনজন। আর তাঁর তত্ত্বের ভবিষ্যৎদ্বাণী করা কণিকাটি বোসন গোষ্ঠির, যার নামের মধ্যে রয়ে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যাত প্রাক্তন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম– বসুর তত্ত্বের দ্বারা

পরিচালিত হয় বলে এরকম কণিকার পুরো শ্রেণীটিকেই বলা হয় বোসন।

আমরা ইলেকট্রো-উইক বলের একীভূতকরণের সাফল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম এর পরবর্তী প্রত্যাশিত সাফল্যের পটভূমি তৈরি করতে– যা মহাবিশ্বের প্রথম মুহূর্তগুলোর পরিস্থিতি বুঝতে আমাদের প্রয়োজন। ইলেকট্রো-উইক তত্ত্বের পরবর্তী যৌক্তিক তত্ত্বটি হলো তার সঙ্গে নিউক্লিয়ার সবল তত্ত্বটিকেও একীভূত করা। এর ফলে অন্তত তিনটি বল– বিদ্যুৎ-চৌম্বক, নিউক্লিয়ার দুর্বল, ও নিউক্লিয়ার সবল– একই তত্ত্বের অধীনে আসে। তাত্ত্বিকভাব এটি ইতোমধ্যে সম্ভব হয়েছে, যদিও এর পরীক্ষণ-প্রমাণ এখনো বাকি। এ তত্ত্বের নাম দেয়া হয়েছে মহাএকীভূত তত্ত্ব– Grand Unification Theory, সংক্ষেপে GUT। সবল তত্ত্বকে এভাবে একীভূতকরণের অন্তর্ভূক্ত করাটি সহজ হয়নি, কারণ যে ধরনের কণিকার উপর সবল বলকে প্রয়োগ করতে হয় তা অন্যগুলোর চেয়ে খুবই আলাদা, এবং সবল নিউক্লিয়ার বলের মাত্রা ও প্রকৃতিও খুবই আলাদা। কিন্তু অত্যন্ত উচ্চ শক্তির পরিস্থিতিতে এই তফাৎগুলো গৌণ হয়ে যায়– তাই মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুর মুহূর্তগুলোতে যে ধরনের অতি উচ্চ উত্তাপ ছিল তাতে ঐ তিন বলই একই তত্ত্বের অধীনে একই প্রতিসাম্যে বিরাজ করতে পারতো। তাই সেই মুহূর্তের ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যায় GUT এর সাফল্য জরুরী।

প্রমাণের আশা LHC যন্ত্রের থেকে

চতুর্থ বলটি হলো মাধ্যাকর্ষণ বল যা অন্য তিনটির তুলনায় এত অভাবনীয় রকমের দুর্বল যে ওগুলোর সঙ্গে তাকে একই প্রতিসাম্যে আনা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। অথচ সাম্প্রতিকতম প্রস্তাবিত তত্ত্ব এটিও সম্ভব করেছে, তাত্ত্বিক ভাবে।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী শুরুতে অতি উচ্চ তাপে চারটি বলই এরকম প্রতিসাম্যে একীভূত ছিল। কিন্তু বিগ্ ব্যাং এর মাত্র $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর উত্তাপ যেটুকু কমেছে তাতে মাধ্যাকর্ষণ বলের ক্ষেত্রে এই প্রতিসাম্য ভেঙ্গে গেছে, মাধ্যাকর্ষণ বল আর বাকি তিনটি বলের সঙ্গে একীভূত থাকেনি। এরপর মাধ্যাকর্ষণ বল একলা চলো নীতিতে চলে গিয়েছে। সময়টি লক্ষ্য করুন– কত ক্ষুদ্র সময় ওটি! $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড মানে একের পর ৪৩টি শূন্য দিলে যত হয় সেকেন্ডের তত ভাগের এক ভাগ! ধর্তব্যের প্রায় বাইরে হলেও বর্তমান বিষয়ের বিবেচনায় এটিও একটি সময়। তারপর বিগ্ ব্যাং এর $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ড পর নিউক্লিয়ার সবল বলও আর অন্যদের সঙ্গে প্রতিসাম্যে থাকেনি। ইলেকট্রো-উইক তত্ত্বের সঙ্গে এ পর্যন্ত একীভূত থাকলেও এরপর উত্তাপ $১০^{২৮}$ ডিগ্রির থেকে নেমে গেলে এটিও একলা চলো নীতিতে চলে এসেছে।

অপর দুটি বল বিদ্যুৎ-চৌম্বক আর নিউক্লিয়ার দুর্বল বলকে কার্যত পৃথক হতে অবশ্য বিগ্ ব্যাং-এর পর এক সেকেন্ড থেকে ১০ সেকেন্ড সময় প্রয়োজন হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে তখন প্রোটনের সংখ্যা নিউট্রনের থেকে অধিকে পরিণত হয়েছে। আজ যে মহাবিশ্বের সর্বত্র হাইড্রোজেনের সঙ্গে হিলিয়ামের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় থাকতে দেখছি, তা সেই সময়েই ঐ কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। এই অনুপাতের পরিমাপে এই শেষোক্ত বিচ্ছিন্ন হবার ঘটনাটি পরীক্ষণে প্রমাণিত। কিন্তু এর আগেরটি অর্থাৎ নিউক্লিয়ার সবল বলের বিচ্ছিন্ন হবার ঘটনা প্রমাণিত এখনো হয়নি। সেই সঙ্গে GUT তত্ত্বের যথার্থতাও প্রমাণিত

হয়নি। সেটি হবে যদি সার্নে অতি সম্প্রতি লার্জ হেড্রোন কোলাইডার (LHC) নামে যে অত্যন্ত উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কণিকা ত্বরক স্থাপিত হয়েছে, তা সফলভাবে কাজ করতে পারে। তাহলে সেখানে কণিকা সংঘর্ষের মাধ্যমে সেই রকম অত্যন্ত উচ্চ শক্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে যে পরিস্থিতি বিগ্ ব্যাং-এর $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ডের মধ্যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির মুহূর্তগুলোতে বিরাজ করছিলো। এ সময় ঐ বিভিন্ন বলগুলোর সবলতা কাছাকাছি ছিল, প্রযোজ্য কণিকাগুলো একে অন্যতে রূপান্তরিত করা যেত, এবং GUT তত্ত্বের সার্বিক প্রতিসাম্যের মধ্যেই তিনটি বলই পরিচালিত হতো। এসব যদি ঠিক হয়, GUT তত্ত্ব যদি নির্ভুল হয়, তা হলে সে রকম পরিস্থিতিতে এক্স বোসন নামের একটি সুনির্দিষ্ট গুণাগুণ সম্পন্ন অতি ভারী কণিকার অস্তিত্ব থাকতে হবে। এটি ঐ কণিকা বিক্রিয়ায় একটি মধ্যস্থতাকারী বোসন হিসেবে কাজ করবে, যেমন বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের ক্ষেত্রে ফোটন কণিকা (আলোর কণিকা) মধ্যস্থতাকারী বোসন হিসেবে কাজ করে। এসব সত্যি হতে হলে সার্নের LHC যন্ত্রে GUT সময়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এই এক্স বোসনকে খুঁজে পেতে হবে। এজন্যই সবাই পরীক্ষাটিকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন।

লার্জ হেড্রন কলাইডার (LHC) নামটি এসেছে হেড্রন কণিকা গোষ্ঠির ভারী ভারী সদস্যদেরকে অত্যন্ত উচ্চ গতিতে নিয়ে গিয়ে তাদের পরস্পর সংঘর্ষ এতে ঘটানো হয় বলে। এক্ষেত্রে যে কণিকা নেয়া হয় তা হলো হয় প্রোটন অথবা সীসার আয়ন। যেটিই নেয়া হোক সেটি একই রকম কণিকা হবে। এদেরকে অত্যন্ত উচ্চ গতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেনেভার কাছে সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের ভূগর্ভে ৫০ থেকে ১৫০ মিটার নিচের বৃত্তাকার সুড়ঙ্গে তৈরি করা হয়েছে বিশাল পরিধির বৃত্তাকার কণিকা ত্বরক। এটি ঐ বৃত্তের পরিধি জুড়ে শক্তিশালী চুম্বকের বলয়ের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া পাশাপাশি দুটি বৃত্তাকার টিউব। বৃত্তটির পরিধি ২৭ কিলোমিটার। এতে অত্যন্ত শক্তিশালী সুপার কন্ডাক্টিং চুম্বকগুলোও দশাসই (যেখানে অতিশীতল পরিবেশে বিদ্যুৎ চুম্বকের বিদ্যুৎ প্রবাহ একটুকুও বাধাপ্রাপ্ত হয়না)। কিন্তু যে টিউব দুটির ভেতর দিয়ে কণিকা ছুটে যায় তা

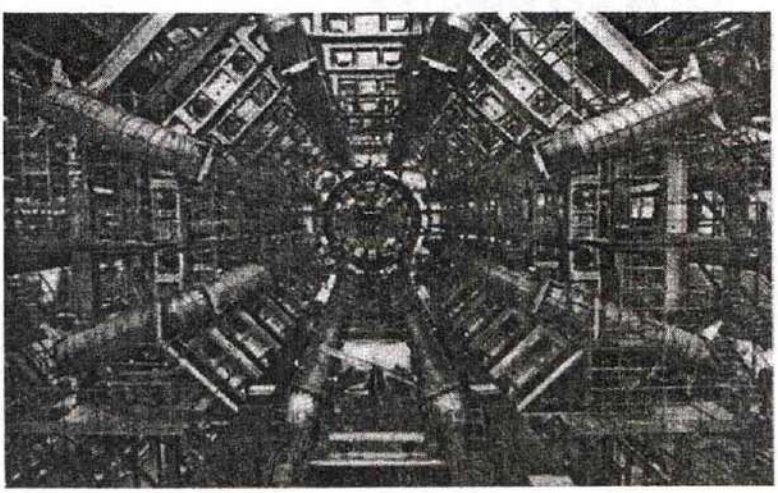

লার্জ হেড্রন কলাইডারের চুম্বক বিন্যাসের একাংশ।
কেন্দ্রে ছোট বৃত্তটির মধ্যে কণিকা ছুটে যাওয়ার টিউব দুটির কর্তিত দৃশ্য

পাশাপাশি দুটি পানির পাইপের মত। এর ভেতর চরম বায়ুশূন্য অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যা মহাশূন্যের বায়ুশূন্যতার সঙ্গে তুলনীয়। ফলে চুম্বকের প্রভাবে কণিকাগুলো বাধাহীনভাবে টিউবদুটির ভেতর দিয়ে বার বার চক্রাকারে ঘুরতে থাকে আর শক্তি সঞ্চয় করে ত্বরিত হতে থাকে। দুটি টিউবে তারা ঘুরে পরস্পর বিপরীত দিকে। প্রত্যাশিত অত্যন্ত উচ্চ গতি লাভের পর তাদেরকে এক জায়গায় দুদিক থেকে প্রচন্ড বেগে এনে সামনাসামনি সংঘর্ষ ঘটানো হয়।

এই সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হতে পারে অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থা যা মহাবিশ্বের আদিতে GUT এর কালের উত্তাপের সঙ্গে তুলনীয়। দুটি টিউবেই ত্বরিত হবে অসংখ্য কণিকা- এক এক গুচ্ছেই লক্ষ হাজার কোটি কণিকা। দুদিক থেকে আসা দুই লক্ষ হাজার কণিকার মধ্যে সংঘর্ষ আশা করা হয় মাত্র বিশটির মধ্যে, কারণ কণিকা তো খুবই ক্ষুদ্র। কিন্তু যেহেতু কণিকাগুলো সেকেন্ডে ৩ কোটি বার পাক খাবে তাই সেকেন্ডে মোট সংঘর্ষ ৬০ কোটির কম হবেনা, এবং তাতে সৃষ্ট উত্তাপও হবে প্রচন্ড। অবশ্য টিউবের মাঝখানে সংঘর্ষ-স্থানে কণিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে সেই উত্তাপ, নলকে বা অন্য কিছুকে নষ্ট করবেনা। সংঘর্ষের ফলে যে উত্তাপ, যে ভগ্নাংশ কণিকা ও শক্তি সৃষ্টি হবে- তাই হবে GUT এর কালের পরিস্থিতির তুলনীয়। এগুলোকে উদ্ঘাটন করার জন্য সেখানে রয়েছে চারটি অতি শক্তিশালী উদ্ঘাটক যন্ত্র। তাদের উদ্ঘাটনের উপরই নির্ভর করবে GUT তত্ত্বের ভবিষ্যৎ এবং বিগ্ ব্যাং কালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের নূতন জ্ঞান।

ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে মনোপোল ও প্রতিকণিকার বিদায়কে

বিগ্ ব্যাং সময়ের এই তত্ত্ব সঠিক হতে হলে সে সময় চৌম্বক মনোপোলের অস্তিত্বও থাকতে হবে। আমরা জানি যে চুম্বক সব সময় উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু– এই দুই মেরু বা ডাইপোল হিসেবে এখন পাওয়া যায়। শুধু উত্তর মেরু বা শুধু দক্ষিণ মেরুর আলাদাভাবে অস্তিত্ব থাকলে তাকে বলা যেত মনোপোল। কিন্তু শুধু একটি মেরু রয়েছে এমন চুম্বকের কথা কবে কে শুনেছে? এখন আমরা নিশ্চিত যে মহাবিশ্বে কোথাও মনোপোল নাই। কিন্তু GUT তত্ত্ব সঠিক হতে হলে সেই বিগ্ব্যাং-এর $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ডের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র সময়কালে মনোপোল থাকতে হবে। তার মানে এর পর মনোপোল বিলুপ্ত হবার একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আমাদের লাগবে– যাকে বলা যায় 'মনোপোল সমস্যা'। এ সমস্যার সমাধানের কথা আমাদেরকে একটু পর মহাস্ফীতি তত্ত্বের সঙ্গেই বলতে হবে।

তবে এক্স কণিকার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারলে অন্য একটি বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তা হলো প্রতিকণিকার বিদায়। GUT তত্ত্ব অনুযায়ী এক্স কণিকার একটি গুণ হতে হবে এটি কণিকাকে প্রতিকণিকায় পরিণত করতে পারে, অন্য কোন জানা কণিকার এই গুণ নাই। আমরা জানি যে ফোটন ছাড়া জানা সব কণিকারই একটি প্রতিকণিকা রয়েছে– যেমন প্রোটনের এন্টি-প্রোটন। কণিকার সমন্বয়ে যেমন গড়া হয় বস্তু, তেমনি প্রতি-কণিকার সমন্বয়ে প্রতিবস্তু। কণিকার সঙ্গে তার প্রতিকণিকা মিলিত হলে উভয়ে ধ্বংস হয়, তেমনি হবে বস্তুর সঙ্গে প্রতিবস্তুর দেখা হলেও। আজ মহাবিশ্বের সর্বত্র থেকে আমরা শুধু বস্তুর খবর পাচ্ছি, প্রতিবস্তুর মোটেই নয়। এখন যদি এভাবে বস্তুর রাজত্ব হয়, তাহলে মহাবিশ্বের শুরুতেও তাই থাকার কথা, কারণ প্রতিবস্তুর বস্তুতে পরিণত

হবার কোন প্রক্রিয়া আমাদের জানা ছিলনা। অথচ মহাবিশ্বের শুরুতে শুধু কণিকা আর প্রতিকণিকা একই সমানে থাকবেনা, তাদের মধ্যে অপ্রতিসাম্য থাকবে, এমন কথাও মেনে নেয়া বৈজ্ঞানিকভাবে অযৌক্তিক। এখন এক্স কণিকার তত্ত্বে দেখা গেল নিউক্লিয়ার সবল বল এবং ইলেকট্রো-উইক বলের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর কাজ করতে গিয়ে এই কণিকা বস্তুকে প্রতিবস্তু, এবং প্রতিবস্তুকে বস্তুতে পরিণত করতে সক্ষম। আরো মজা হলো এক্স কণিকা এবং তার প্রতিকণিকা একে অপরে পরিণত হবার মধ্যে পূর্ণ প্রতিসাম্য নাই– উভয়ের হার এক নয়। এক্স কণিকার এই গুণ আমাদেরকে প্রতিবস্তুর সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার সুযোগ করে দিয়েছে। মহাবিশ্বের শুরুতে GUT এর যুগে যত এক্স কণিকা তার প্রতিকণিকায় পরিণত হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি প্রতিকণিকা এক্স কণিকায় পরিণত হয়েছিল। কাজেই সেই শুরুর যুগেই প্রতিকণিকার থেকে কণিকার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– পরে কণিকা প্রতিকণিকার মিললে উভয়ের সমান সংখ্যকের বিলুপ্তির পরও হাতে থাকা অতিরিক্ত কণিকাগুলো রয়ে গেছে আজকের বস্তু জগত হিসাবে– যেখানে প্রতিবস্তুর স্থান নেই। এক্স কণিকা খুব ভারী এবং অত্যন্ত অস্থায়ী। সেই আদি সময়েই এটি কোয়ার্ক আর ইলেকট্রনে পরিণত হয়েছে– যা শেষ পর্যন্ত আজকের কণিকাগুলোর রূপ পেয়েছে। GUT তত্ত্বের জন্য দরকারী চৌম্বক মনোপোলের ক্ষেত্রে কিন্তু এক্স কণিকার মতো ওভাবে রূপান্তরিত হয়ে চলে যাওয়ার কোন সুযোগ নাই। তাই মনোপোল সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

তিন মিলিমিটার আয়তনের বিশ্বও কেন অতিরিক্ত বৃহৎ?

শুধু মনোপোল সমস্যা নয়, আরো নানা সমস্যা মহাবিশ্বের প্রথম মুহূর্তগুলোর ব্যাখ্যাকে জর্জরিত করছিলো। আমরা আজকের মহাবিশ্বের পরিস্থিতি থেকে পেছনের দিকে গিয়ে শেষ অবধি যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মহাবিশ্ব পাচ্ছি তার সঙ্গেই এরকম কিছু সমস্যা নিহিত। এটি বুঝতে কিছু সোজাসাপটা হিসেব করা যাক। বর্তমানে যে মহাবিশ্ব আমাদের কাছে দৃশ্যমান হতে পারে তাকে বলা যায় আমাদেরকে কেন্দ্র করে চৌদ্দ শত কোটি আলোক-বর্ষ ব্যাসার্দ্ধের একটি গোলক। কারণ বিগ্ ব্যাং এর পর চৌদ্দ শত কোটি বছরে সেই বিন্দুবৎ মহাবিশ্ব এখন যে আয়তনে পৌঁছেছে তার মধ্যে দূরতম সে অংশকেই আমরা দেখতে পারি যার থেকে আলো চৌদ্দ শত কোটি বছর আগে যাত্রা শুরু করেছে– অর্থাৎ তা চৌদ্দ শত কোটি আলোক-বর্ষ দূরে। এর আগের কিছু আমাদের দেখার সুযোগ নাই। তাই এই গোলকই আমাদের 'বিশ্ব-দিগন্ত'। এখন সময়ের পেছনে দিকে গেলে আমরা দেখতে পাব মহাবিশ্বের এই গোলকটি আগে অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল– যত পেছনে যাব তত ছোট। অতীতে কোন সময়ে গোলকটি কত ছোট ছিল তা জানার জন্য আমরা এর আজকের উত্তাপের সঙ্গে তখনকার উত্তাপের তুলনা করতে পারি। অতীতে মহাবিশ্ব যেমন যত ছোট ছিল তেমনি তত উত্তপ্তও ছিল– ব্যাসার্দ্ধের ছোট হওয়াকে আমরা উত্তাপের বেশি হওয়ার সমানুপাতিক মনে করতে পারি। আমরা দেখেছি আজকের মহাবিশ্বের উত্তাপ কেলভিন স্কেলে ৩ ডিগ্রি। আর এও আমরা GUT তত্ত্ব থেকে জানি যে GUT-এর সময় মহাবিশ্বের উত্তাপ ছিল $১০^{২৮}$ ডিগ্রি। কাজেই চৌদ্দ শত কোটি আলোক-বর্ষ ব্যাসার্দ্ধের গোলকের উত্তাপ যদি ৩ ডিগ্রি হয়, তাহলে $১০^{২৮}$ ডিগ্রি উত্তাপের

গোলকের ব্যাসার্দ্ধ কত হবে তা আমরা ঐকিক নিয়মে সহজেই বের করে ফেলতে পারি। এই ব্যাসার্দ্ধ দাঁড়ায় প্রায় ৩ মিলিমিটার। অর্থাৎ আজকের এই বিশাল মহাবিশ্ব অতীতে GUT এর যুগে, মানে বিগ্ ব্যাং-এর $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ড পর ছিল মাত্র ৩ মিলিমিটার ব্যাসার্দ্ধের ছোট্ট একটি পূঁতির দানার আয়তনের। এটি জেনে আমাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত– এত ছোট ছিল মহাবিশ্ব! কিন্তু বিজ্ঞানীদের প্রতিক্রিয়া হয়েছে ঠিক তার উল্টো। এটি জেনে তাঁরা মহাসমস্যায় পড়লেন এই ভেবে যে বিশ্ব তখন এত বেশি বড় হলে তো বিপদের কথা। $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ডের বয়সে ৩ মিলিমিটার বিশ্ব তাঁদের তত্ত্বের দিক থেকে অত্যন্ত অসুবিধাজনকভাবে বিশাল একটি বিশ্ব। অসুবিধাটি কোন দিক থেকে তা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

আলোর গতিবেগ হলো সেকেন্ডে ৩×১০^{১০} সেন্টিমিটার। এই গতিতে বিগ্ ব্যাং-এর পর $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ডে আলো যেতে পারে মাত্র $১০^{-২৫}$ সেন্টিমিটার অর্থাৎ $১০^{-২৪}$ মিলিমিটার দূরত্ব। অথচ উপরের হিসাবে মহাবিশ্ব তখন ৩ মিলিমিটার ব্যাসার্দ্ধের গোলক। এই গোলকের অতি অতি ক্ষুদ্র অংশ তাই আলো অতিক্রম করতে পেরেছে ঐ সময়ে। কাজেই ঐ সময়ের মধ্যে আলোর পক্ষে ঐ ৩ মিলিমিটার বিশ্বের নানা অংশের মধ্যে যোগাযোগ বা সমন্বয় রক্ষা করার কোন উপায়ই ছিলনা। অথচ আলোর চেয়ে অধিক গতিরও কিছু নাই যাতে সেই সমন্বয় ঘটতে পারে।

আজকের মহাবিশ্বকে আমরা এত মসৃণ হিসেবে দেখছি যে (CMB'র মাধ্যমে) সেই মসৃণতা নিশ্চয়ই আদি মুহূর্তগুলোতে বিশ্বে সৃষ্টি হতে হয়েছে ঘর্ষণ বা এমনি কোন প্রক্রিয়ায় সকল অমসৃণতাকে 'ইস্তারি করার মত' দূর করে দিয়ে। আলোই যদি ঐ সময়ে ঐ বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত না হতে পারে তা হলে নানা অংশের সমন্বয়ে এই সুসমতা ঘটবে কী ভাবে? এভাবে বিশ্বের সর্বত্র সবদিকে সমান মসৃণতা, সমান উত্তাপ ইত্যাদি ঘটার মত কোন আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ তখন সম্ভব ছিলনা যদি সেদিনের বিশ্ব ৩ মিলিমিটারের মতো এত বড় হয়ে থাকে। কাজেই এ সমস্যা এড়াতে হলে বিশ্বকে তার সৃষ্টির মুহূর্তগুলোতে আরো অনেক অনেক ক্ষুদ্র থাকতে হবে। অথচ আজকের আয়তন থেকে পেছনের দিকে গিয়ে আমরা ৩ মিলিমিটার আয়তনই পাচ্ছি। এর একটিই সমাধান হতে পারে: ধরে নেয়া যে সেই শুরুর মুহূর্তগুলোরও শুরুতে মহাবিশ্ব অনেক ক্ষুদ্র ছিল– হঠাৎ করে কোন কারণে ক্ষণিকের মধ্যে স্ফীত হয়ে ফুলে গিয়ে এটি ৩ মিলিমিটার বা তারো বড় হয়ে গিয়েছে। তা হলে আগের ও পরের দুই কূলই রক্ষা হয়। ঠিক এমনি একটি সমাধান নিয়ে এলেন এ্যালান গুথ নামক বিজ্ঞানী ১৯৭৯ সনে, যা একই সঙ্গে অনেকগুলো সমস্যার সুরাহা করে দিল। একেই বলা হয় ইনফ্ল্যাশন থিওরী যার অর্থ স্ফীতি তত্ত্ব– আমরা বলতে পারি মহাস্ফীতি তত্ত্ব।

মহাস্ফীতি তত্ত্ব

উল্লেখিত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য মহাস্ফীতি তত্ত্ব ধরে নেয় যে সৃষ্টির একেবারে আদি মুহূর্তে বিশ্ব খুউব অল্প সময়ের জন্য অত্যন্ত দ্রুত ও ক্রমবর্দ্ধমান হারে অনেক গুণে বড় হয়ে গেছে। বিগ্ ব্যাং-এর $১০^{-৩৩}$ সেকেন্ড পর শুরু হয়ে $১০^{-৩৩}$ সেকেন্ডে এটি শেষ হয়ে যায়– সময়টির স্বল্পতা কল্পনা করাও কঠিন। কিন্তু এই একটু খানি সময়ের মধ্যে

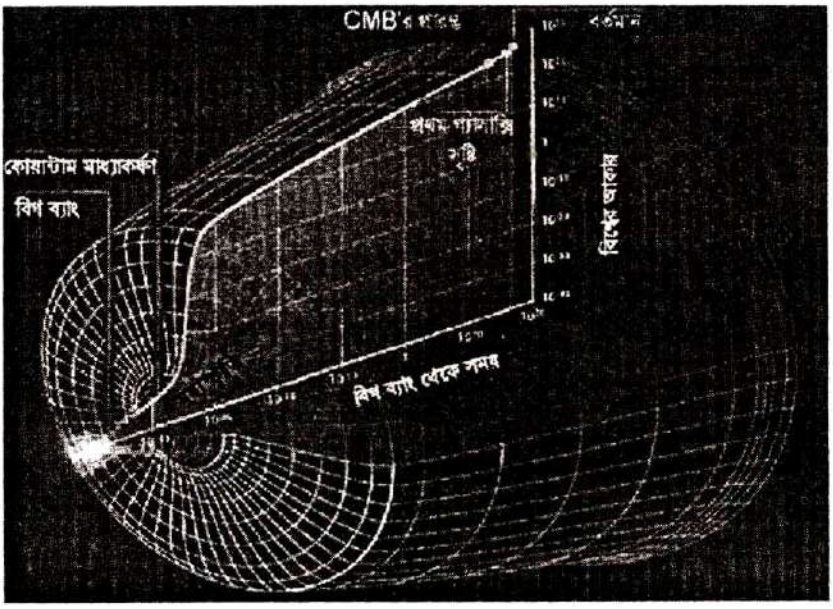

মহাস্ফীতি ও তারপর

সদ্যজাত বিন্দুবৎ মহাবিশ্বটি $১০^{৩০}$ গুণ স্ফীত হয়ে পড়েছে। চিন্তা করুন, ১ এর পর ৩০টি শূন্য দিলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় ততগুণ স্ফীত হয়ে পড়েছে এটি। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অত বেশি স্ফীত হতে যে গতিতে তাকে বড় হতে হয়েছে তা আলোর গতিকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু তাতে পদার্থবিদ্যার কোন নিয়ম লঙ্ঘন হয়নি, কারণ এক্ষেত্রে কোন বস্তু বা শক্তি আলোর গতিতে যায়নি। যা ঐ গতিতে বেড়েছে তা হলো মহাবিশ্বের স্পেইস বা স্থান– পদার্থবিদ্যায় তাতে কোন বাধা নাই। কীভাবে এই মহাস্ফীতি ঘটতে পারে সে কথায় আমরা পরে আসবো। আগে দেখি এই মহাস্ফীতি ঘটে থাকলে তাতে আমাদের ব্যাখ্যার কী কী সুবিধা হয়ে গেল।

এটি যদি ঘটে তা হলে বিগ্ ব্যাং-এর পর $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ড অতিবাহিত হবার আগে মহাবিশ্ব অনেক ক্ষুদ্র ছিল বলে মেনে নেয়া যায়, এত ক্ষুদ্র যে আলো তার সারাটা অবয়বে ঐ ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়তে কোন অসুবিধা হয়নি। ফলে তার সকল অংশ পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়ায় মসৃণ হতে পরেছে, তা সব দিকে সমসত্ত্ব হতে পেরেছে, যার ধারাবাহিকতায় আজ এত প্রকান্ড হয়েও মহাবিশ্ব মসৃণ রয়েছে। অন্য দিকে বিগ্ ব্যাং-এর পর $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ড অতিবাহিত হবার পর পরই মহাবিশ্ব অস্বাভাবিক দ্রুততায় স্ফীত হয়েছে যার ফলে যথা সময়ে আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে ৩ মিলিমিটার ব্যাসার্দ্ধের ধর্তব্যের মত আয়তনে চলে আসতে পেরেছে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবার মতো– যেন 'মাইক্রো' সাইজ থেকে হঠাৎ করে 'ম্যাক্রো' সাইজে। ফলে আজকের মহাবিশ্ব থেকে সময়ে পেছনে গিয়ে আমরা যে সাইজে GUT এর কালে তাকে পাওয়ার কথা সেই সাইজেই পেতে পারি। আয়তন ও মসৃণতায় বনিবনা না হওয়ার সমস্যাটি আর তাহলে থাকেনা। বিগ্ ব্যাং এর প্রথম মুহূর্তের ও মহাবিশ্বের বাকি পুরো ইতিহাসের মাঝখানে একটি বেঢক ঘটনার ব্যবধান রচনা করেই এটি সম্ভব হলো। ক্ষণিকের সেই

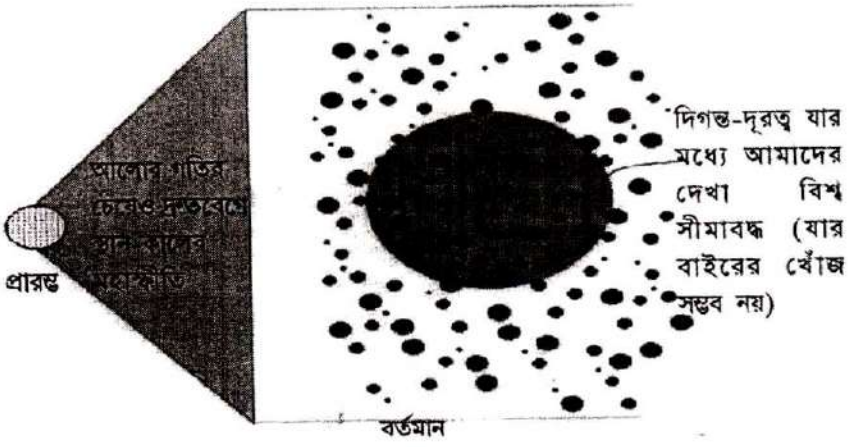

মহাস্ফীতির ফলে আমাদের বিশ্ব দিগন্ত-দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ

ব্যবধানটি হলো মহাস্ফীতি।

ওদিকে মনোপোল সমস্যাটিও সমাধান করে দেয় মহাস্ফীতি। GUT এর যুগে ঐ তত্ত্বের কারণে যে চৌম্বক মনোপোল দেখা দেয়ার কথা মহাবিশ্বের ঐ অতি ক্ষুদ্র অবয়বের মধ্যে বড় জোর দু'একটি মনোপোল থাকতে পারে তার বেশি নয়। বিশ্বটি যখন স্ফীত হয়ে বহু বহু গুণে বড় হয়ে পড়ে তখন সেই এক আধটি মনোপোলের কোন পাত্তা সেখানে থাকেনা। এগুলো আমাদের বিশ্ব-দিগন্তের বাইরে চলে যায়। মসৃণতার সম্পর্কেও ঠিক এমন কথা যোগ করা যায়। ঐ আদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিশ্বের মধ্যে কিছুটা অমসৃণতা যদি থেকেও থাকে- বিশ্ব স্ফীত হবার ফলে ঐ অল্প এক আধটু অমসৃণতা আমাদের বিশ্ব-দিগন্তের বাইরে চলে গিয়েছে। আমাদের এই দিগন্ত তো এখন চৌদ্দ শত কোটি আলোক–বর্ষ দূরে। মনোপোল ও অমসৃণতা তারও বাইরে চলে গেলে সেগুলো আমরা দেখতে পাবোনা, কারণ সেখান থেকে আলো কখনো আমাদের কাছে এসে পৌঁছার সময় পাবেনা। মহাস্ফীতি আলোর গতির থেকে অধিক গতিতে মহাবিশ্বকে প্রসারিত করার ফলেই এমনটি ঘটেছে। আমাদের দেখতে পারা, জানতে পারা বিশ্বের ব্যাসার্দ্ধ এখন চৌদ্দ শত কোটি আলোক-বর্ষ হলেও জানতে না পারা অংশ সহ এটি তার চেয়ে অনেক বড়। তবে ঐ বাড়তিটুকু সব সময় আমাদের পর্যবেক্ষণের বাইরে থেকে যাবে। মহাস্ফীতির প্রভাব আমাদের উপর আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে রয়েছে, সেটি একটু পরে দেখবো।

মহাস্ফীতি কেন হয়েছিলো?

মহাবিশ্বের শুরু থেকেই তার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বল সক্রিয় ছিল। কাজেই এটি যখন প্রসারিত হয়েছে তখন এই মাধ্যাকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে গিয়েই তা হয়েছে। মহাস্ফীতি তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে বিগ্ ব্যাং এর প্রসারণের ব্যাপারটি যত ভাবেই দেখা হয়েছে সবটাতেই প্রসারণকে শাসনে রেখেছে এই মাধ্যাকর্ষণ ক্রমবর্দ্ধমান হারে প্রসারিত এটি হতে

পারেনি। অর্থাৎ ত্বরিত হতে পারেনি বরং প্রসারণের হার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ক্রমে কমেছে। মহাস্ফীতি সে ধারণাকে বদলে দিয়েছে। মহাস্ফীতির সময় মাধ্যাকর্ষণ সাময়িকভাবে বিকর্ষণে পরিণত হয়েছে, যার ফলে ক্রম বর্ধিত বেগে স্ফীতি বা প্রসারণ ঘটেছে ঐ ক্ষণিকের জন্য। আধুনিক কণিকাবিদ্যা তাত্ত্বিক ভাবে এ সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে যাতে খুবই ঘন অবস্থায় বস্তুর মধ্যে এমনি একটি ঋণাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ বিকর্ষণের সৃষ্টি হয়। সবল নিউক্লিয়ার বল যখন প্রতিসাম্য ভেঙ্গে ইলেকট্রো-উইক এর সঙ্গে একীভূত অবস্থা থেকে পৃথক হয়ে যায় ঠিক তার প্রভাবেই ঐ সময় এমনটি যে হবে তা কণিকাবিদ্যার তত্ত্ব সমর্থন করে।

বিষয়টিকে আরো একটু অন্যভাবে দেখা যায়, যা একটি উপমা দিয়েই ভাল বুঝা যাবে। উপমাটি হলো সমুদ্রে সাইক্লোনের। সাইক্লোন সৃষ্টির পেছনে শক্তি যোগায় জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে আবার পানি হবার ফলে বেরিয়ে আসা সুপ্ত তাপ। পানি জমে যখন বরফ হয় তখনো এমনটি ঘটে। আসলে বরফ গলার সময় যে তাপ শোষণ করে, বা পানি বাষ্পীভূত হবার সময় যে তাপ শোষণ করে, তাই সুপ্ত তাপ হিসেবে ওতে জমা থাকে। উল্টা ঘটনায় এই সুপ্ততাপই বেরিয়ে আসে। সমুদ্রের জলীয় বাষ্পের দশা পরিবর্তন করে পানি হবার সময় এই যে অতিরিক্ত শক্তি বের হয় তাই সাইক্লোনে শক্তি যোগায়। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে তুলনীয় ঘটনা ঘটেছে। বলের প্রতিসাম্য ভাঙ্গার সময় এমনি ভাবে উচ্চ শক্তির অবস্থা থেকে নিম্নশক্তি অবস্থায় আসার ফলে অনেকখানি অতিরিক্ত শক্তি বেরিয়ে আসে। তাই ও সময় ক্ষণিকের জন্য বিকর্ষণ বল সৃষ্টি হয়, মহাস্ফীতি ঘটে।

পরে নিম্নতম শক্তিমাত্রায় সবকিছু স্থিত হলে মহাস্ফীতির ব্যাপারটি শেষ হয়ে যায় এবং মহাবিশ্বের প্রসারণের গতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। অর্থাৎ তখন প্রসারণ আর বিকর্ষণের মাধ্যমে ঘটেনা, বরং বরাবরের মত মাধ্যাকর্ষণের উপস্থিতিতেই ঘটে এবং মধ্যাকর্ষণের বিপরীতে এটি হতে গিয়ে প্রসারণের হার ক্রমে কমে আসে। কিন্তু মহাস্ফীতি প্রসারণকে যে উচ্চ গতিতে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তার প্রভাব থেকে গেছে এরপরও এখন পর্যন্ত।

এই প্রভাব মানে এই উচ্চ গতির প্রসারণের ফলেই মহাবিশ্বে আমরা আসতে পেরেছি। মহাস্ফীতি যদি না হতো তা হলে কম প্রসারণ গতির কারণে গ্যালাক্সি সৃষ্টির সুযোগ পাওয়ার অনেক আগেই মাধ্যাকর্ষণের ফলে প্রসারণ কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় নেমে উলটো সংকোচিত হতে শুরু করতো মহাবিশ্ব। ফলে তারা, গ্রহ, ইত্যাদি সৃষ্টির প্রশ্নই উঠতো না। তার মানে আমাদের সূর্য, সৌর মন্ডল কিছুই তৈরি হতোনা, আমরাও আসতামনা। যেন আমাদের আসার জন্যই এই মহাস্ফীতি হওয়াটা অত্যন্ত জরুরী ছিল। শুধু তাই নয়, এর আগে আমরা দেখেছি গ্যালাক্সি ও তারা সৃষ্টির জন্য বস্তু ঘনীভূত হওয়ার দরকার হয়েছে, যার জন্য দরকার হয়েছে সাধারণ মসৃণতার মধ্যেও কিছু ঘনত্বের তারতম্য অর্থাৎ অমসৃণতা। যদি মহাস্ফীতি না হতো তা হলে প্রথম মুহূর্তের ক্ষুদ্র মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতর অমসৃণতাগুলো বিবর্ধিত হয়ে তারা সৃষ্টির মতে উপযুক্ততা পেতনা। তাছাড়া আমরা দেখেছি ঐ ঘনত্ব বৈষম্যের ফলে বস্তুর পুঞ্জীভবনের সময় গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জ, গ্যালাক্সিপুঞ্জ, তারা, সব কিছুর স্কেলে পুঞ্জীভবনের হার একই থাকে। আদিতে একটি বিকর্ষণের মত অবস্থার মধ্য দিয়ে গেলেই শুধু সব স্কেলে এই হার এক থাকতে পারে। এও মহাস্ফীতির তত্ত্বের পক্ষে একটি বড় সাক্ষ্য। এভাবে মহাবিশ্বের নানা বাস্তবতার ব্যাখ্যার

জন্য মহাস্ফীতি তত্ত্ব অপরিহার্য।

মজার ব্যাপার হলো মহাস্ফীতির ধার দুদিকেই কাটে। একদিকে বিশ্বের আদি মুহূর্তের খুবই সামান্য ঘনত্ব-বৈষম্যগুলোকে স্ফীত করে গ্যালাক্সির বস্তু পুঞ্জীভবনের সুযোগ এটি করে দিয়েছে। অন্যদিকে দ্রুত বিশালভাবে স্ফীত হয়ে যাওয়ার ফলে সাধারণভাবে বিশ্বের অমসৃণতাগুলো দূর হয়ে এটি ব্যাপক মসৃণতা পেয়েছে। কোন কিছুকে দ্রুত অনেক স্ফীত করলে এর আগেকার কুচকানো অমসৃণতা কেমন ভাবে মিলিয়ে যায় একটি বেলুন ফুলিয়ে তার টান টান পৃষ্ঠদেশ দেখলে বা তাতে হাত বুলালেই আমরা তা বুঝতে পারবো। অবশ্য একেবারে আদিতে ক্ষুদ্র বিশ্বে প্রয়োজনীয় ঐ সামান্য ঘনত্ব-বৈষম্যগুলোই বা কীভাবে এসেছিলো তা আমরা দেখবো আগামী অধ্যায়ে।

কিছু নয় থেকে কিছু, সেটিই মহাবিশ্ব

আদি অবস্থায় অনিশ্চয়তা

ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থা থেকে কালের হিসেবে পেছনের দিকে গিয়ে আমরা মহাস্ফীতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। ঐ পর্যন্ত মোটামুটি পদার্থবিদ্যার স্বাভাবিক নিয়মেই পুরো কাল পরিক্রমণটি অনুসরণ করতে পারি। এই পরিক্রমণে যখন যা যেভাবে পাওয়ার কথা ঠিক তেমনি পাব– যেমন প্রথম গ্যালাক্সি গঠন হবার কালে, অথবা বস্তু থেকে শক্তি বিযুক্ত হওয়ার কালে (আজ যা CMB), ইত্যাদি। কিন্তু মহাস্ফীতির আগের মুহূর্তগুলোতে এভাবে আজকের পরিস্থিতি থেকে পৌঁছা, বা সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে হিসেব করে বের করা, সম্ভব নয়। মহাস্ফীতি যেন ইতিহাসের শ্লেটটি মুছে দিয়েছে, তার আগের কিছু আজকের রেকর্ড থেকে জানার উপায় নেই। নানা অর্থেই সেটি একটি অনিশ্চয়তার সময়, আমরা শুধু বিভিন্ন সম্ভাব্য তত্ত্বের মাধ্যমে সে সময়ের কথা আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। সেগুলো এখন সরাসরি পরীক্ষণে সুনিশ্চিত হবার উপায় নেই। তবে তত্ত্বগুলো গাণিতিকভাবে অনেকটা নিঁখুত, এবং সেগুলো প্রধানত নির্ভর করছে পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর, যা পরীক্ষণে ও প্রযুক্তিতে একেবারেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বলতে গেলে আজকের পদার্থবিদ্যা ও আধুনিক প্রযুক্তির অনেকখানিই কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল।

মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থা সে আদি মুহূর্তের অবস্থার উপর নির্ভর না করার ফলশ্রুতি হলো ঐ সময়ের জন্য কয়েকটি বিকল্প অবস্থার কথা ভাবা যায়, যার কোনটির সঙ্গেই আজকের অবস্থার কোন বিরোধ নাই। এর যে কোন একটি আদি পরিস্থিতি থেকে আজকের অবস্থায় আসা সম্ভব। যেমন একটি বিকল্প হতে পারে আদিতে একটি সসীম ঘনত্ব নিয়ে মহাবিশ্বের শুরু। আর একটি বিকল্প হতে পারে আগের কোন সংকোচন পর্ব শেষে এই আদি মুহূর্তে প্রসারণ শুরু হয়েছে। তৃতীয় আর একটি বিকল্প হতে পারে এর আগের কোন চিরস্থায়ী অবস্থা থেকে হঠাৎ বদলে গিয়ে এই প্রসারণ শুরু হয়েছে। চতুর্থ আর একটি বিকল্প হতে পারে এটি প্রারম্ভহীন– যত পেছনে যাব তত ক্ষুদ্র বিশ্ব, এভাবে চলতেই থাকবে আরো ক্ষুদ্রের দিকে অসীম ভাবে, কিন্তু কখনো শূন্য অবয়ব হবেনা। বর্তমান পদার্থবিদ্যা ঐ আদি চরম অবস্থায় পুরোপুরি প্রযোজ্য নয় বলে, এবং নূতন তত্ত্ব এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে, এর কোন একটি বিকল্প বেছে নেয়া এখনই সম্ভব নয়, এ পর্যায়ে একাধিক সম্ভাবনা থেকেই যায়।

কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা তত্ত্ব

কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি মৌলিক উপাদান হলো এর অনিশ্চয়তার তত্ত্ব। অনিশ্চয়তার তত্ত্ব অনুযায়ী কোন কণিকার অবস্থান এবং ভরবেগ উভয়েই একেবারে নিঁখুত ভাবে নির্ণয় তাত্ত্বিক কারণেই সম্ভব নয়। একটি যত নিঁখুত হবে অন্যটি ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। একই ভাবে শক্তি এবং সেই শক্তির উপস্থিতির সময়, এই দুইও একই সঙ্গে নিঁখুত ভাবে নির্ণয় সম্ভব নয়। এসব অনিশ্চয়তা নির্ভর করে প্ল্যাংক ধ্রুবক নামে খুবই ক্ষুদ্র একটি সংখ্যার উপর। গাণিতিক ভাবে বলতে গেলে অবস্থান ও ভরবেগ উভয়ের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার পরিমাণটি গুণ করলে তা ঐ প্ল্যাংক ধ্রুবকের সমান হবে। শক্তি ও সময়ের অনিশ্চয়তা গুণ করলেও। এ সবের অর্থ এই দাঁড়ায় যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী একেবারে ক্ষুদ্র মানে গিয়ে অবস্থান, ভরবেগ, শক্তি কোনটাই সুনির্দিষ্ট নয়, সেখানে প্ল্যাংক ধ্রুবক দ্বারা নির্ধারিত একটি সূক্ষ্ম আবছা অবস্থা থাকে– একটি ক্ষুদ্র উত্থান-পতন বা ফ্লাকচুয়েশন্– যাকে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন বলা হয়। কাজেই সম্পূর্ণ ভ্যাকুয়াম বা 'শূন্য' বলে কিছু নেই– আছে একটি ক্ষুদ্রতম অবস্থা যা ঐ কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন। সময়ের দিক থেকে ঐ ক্ষুদ্রতম অবস্থা $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ডের মত যাকে বলা হয় প্ল্যাংকের সময়। এমনি ভাবে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন হয় এমন ক্ষুদ্রতম দূরত্ব হলো $১০^{-৩৫}$ সেন্টিমিটার, যাকে বা হয় প্ল্যাংক দূরত্ব। এগুলো যে কত ক্ষুদ্র তা শুধু কল্পনাই করা যায়। এগুলো ক্ষুদ্র বলে এই মাত্রায় ঘনত্ব হবে সেভাবেই কল্পনাতীত বিশাল– প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে $১০^{৯৪}$ গ্রাম, যাকে বলা হয় প্ল্যাংক ঘনত্ব। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী তাই $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ডের চেয়ে ছোট কোন সময়ের বা $১০^{-৩৩}$ সেন্টিমিটারের চেয়ে ছোট কোন দূরত্বের কোন অর্থ নেই– সেখানে শুধু ফ্লাকচুয়েশন। যাকে আমরা বলছি শূন্য বা ভ্যাকুয়াম, তাতেও কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন থাকতে বাধ্য, কোয়ান্টাম তত্ত্বের অমোঘ নীতি সেটি বলে দিচ্ছে। সেই ফ্লাকচুয়েশনের পরিধিটিই তাত্ত্বিক ভাবে সম্ভব সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরিধি– কখনোই তা শূন্য হতে পারে না। সাধারণ জ্ঞানে মেনে নেয়া কঠিন হলেও কোয়ান্টাম তত্ত্ব যেহেতু প্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রমাণিত (যেমন একে ছাড়া ইলেকট্রনিক্স, পরমাণু বিদ্যা সহ আজকের পদার্থবিদ্যা ও প্রযুক্তির অনেকখানিই অসম্ভব), একে মেনে না নিয়ে উপায় নাই। আমরা দেখেছি অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ী শক্তির অনিশ্চয়তা খুব ছোট হলে সময়ের অনিশ্চয়তা অনেক বেড়ে যায়। শক্তি যখন শূন্যের কাছাকাছি, তার অনিশ্চয়তাও শূন্যের কাছাকাছি। তাই শক্তির আর সময়ের অনিশ্চয়তার গুণফল যেহেতু সুনির্দিষ্ট ধ্রুবক, সময়ের তখন প্রায় অসীম অনিশ্চয়তা। অর্থাৎ ঐ ক্ষুদ্র শক্তি অত্যন্ত বিস্তৃত সময় ধরে স্থায়ী হতে পারে। এই অনিশ্চয়তাই সময়ের দীর্ঘ বিস্তৃতি দিয়ে এনে দেয় শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টির সুযোগ।

শূন্য থেকে মহাবিশ্ব কীভাবে এলো?

কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের কারণে ঐ অনিশ্চয়তার মধ্যে শূন্যের থেকে শক্তি ধার করা যায়, অবশ্য যদি সময়ের অনিশ্চয়তার মধ্যেই ধার করা শক্তি আবার শূন্যকে ফেরৎ দিয়ে দেয়া যায়। শক্তির অনিশ্চয়তার পরিমাণ যখন শূন্যের কোঠায়, সময়ের অনিশ্চয়তা তখন অনেক বিস্তৃত বলে ঐ ধার করা শক্তি সেক্ষেত্রে আর সহসা ফেরৎ দিতে হয়না। ঐ

সময়ের মধ্যে যদি মহাস্ফীতি এসে সেই ধার করা সামান্য শক্তি ও স্থান-কালকে হঠাৎ করে ফাঁপিয়ে বিশালে পরিণত করতে পারে, তা হলে তাই এগিয়ে যেতে পারে আজকের মত মহাবিশ্ব হতে। মনে রাখতে হবে আধুনিক পদার্থবিদ্যার কাছে যা শক্তি তা বস্তুও তা বটে। বর্তমান তত্ত্ব মহাবিশ্বকে এভাবেই প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে সৃষ্ট বলে মনে করে। মূলত যা ছিল তা হলো কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন, আর একভাবে দেখলে কোয়ান্টাম ফেনায় বুদবুদ। ঐ প্ল্যাংক সময়ের মধ্যে, প্ল্যাংক দূরত্বের মধ্যে, শুধু ফ্লাকচুয়েশনের কোয়ান্টাম ফেনাই থাকতে পারে। এর মধ্যে অনিশ্চয়তার সুযোগে ধার করা সেই ক্ষুদ্র শক্তি প্ল্যাংক দূরত্ব সাইজের বুদবুদের মত দেখা দিয়ে বিলুপ্ত হচ্ছিল (সে জন্যই ব্যাপারটিকে ফেনা বলা হচ্ছে)। মহাস্ফীতি এই বুদবুদকেই মহাবিশ্বে পরিণত করেছে। কাজেই আমরা বলতে পারি কিছু নয় থেকেই এভাবে সৃষ্টি হয়েছে কিছু, এবং সেটি যেই সেই কিছু নয়– আমাদের মহাবিশ্ব।

কোয়ান্টাম ফেনায় বুদবুদ সৃষ্টি আসলে শূন্য থেকে কণিকা ও প্রতি-কণিকার জোড় সৃষ্টিরই অনুরূপ। এইসব কণিকাকে বলা হয় ভার্চুয়াল কণিকা অর্থাৎ অলীক কণিকা, কারণ এরা আবার প্ল্যাংক সময়ের ভেতরেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই অলীক কণিকাগুলো থেকেই যদি বাস্তব মহাবিশ্ব তৈরি হয়ে থাকে তা হলে আজ এখানে বস্তু রয়েছে, অথচ প্রতিবস্তু গেল কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছি। GUT তত্ত্ব অনুযায়ী এক্স বোসন কণিকা ও তার প্রতিকণিকার অবক্ষয় হারে প্রতিসাম্য না থাকায় শেষ অবধি প্রতিবস্তু মহাবিশ্বে থাকেনি। আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় শূন্য থেকে যদি বিশ্ব সৃষ্টি হয় তাহলে তার নিজ-মাধ্যাকর্ষণে নিজের মধ্যে ধস নামার ফলে এটি তো আবার সংকুচিত হয়ে বিন্দুতে পরিণত হবার কথা। এমনটি ঘটলে সেই সিঙ্গুলারিটির কবলে পড়তে হবে যা অসীম ঘনত্বের মত অগ্রহণযোগ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বের মধ্যেই এই যুক্তির খন্ডন রয়েছে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী একেবারে বিন্দুবিশ্ব সম্ভব নয়– কারণ প্ল্যাংক দূরত্বের চেয়ে আর ছোট কোন কিছু হতে পারেনা। ঐ পর্যায়ে গিয়ে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের অনিশ্চয়তার কুয়াশাবৎ অবস্থায় তাকে থাকতে হয়, তার সুনির্দিষ্ট বিন্দু হবার সুযোগ নাই। এভাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্বটি তার বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তিকে খন্ডন করে এখন যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত।

শূন্য থেকে শূন্য

শূন্য থেকে বিশ্ব গড়ার সব যুক্তি মেনে নিয়েও পদার্থবিদ্যার একটি অতি সাধারণ ও মৌলিক স্তম্ভে এসে বিষয়টি ধাক্কা খায়। বস্তুর নিত্যতা, শক্তির নিত্যতা এবং আরো আধুনিক ভাবে শক্তি ও বস্তুর সামগ্রিক নিত্যতা– এটি পদার্থবিদ্যার সেই স্তম্ভটি। আগে যা শূন্য এখন তা অনেক– তা হলে সেই নিত্যতা রইলো কোথায়? কিন্তু বিশ্ব আজ কী অর্থে 'অনেক' তা বুঝা যাবে সামগ্রিকভাবে যদি তার বিভিন্ন ভৌত মানগুলোর খতিয়ান নেয়া হয়। সেটি করার সময় একটি শর্ত অবশ্য আরোপ করতে হবে তা হলো মহাবিশ্ব একটি 'বদ্ধ' (closed) সত্ত্বা, নিজের মধ্যেই নিজে আবদ্ধ। এর বাইরের সঙ্গে তার কোন লেন-দেন নাই।

মহাবিশ্বকে যদি আমরা বদ্ধ বলে ধরে নিতে পারি তা হলে তার মধ্যে সামগ্রিকভাবে সকল

শক্তিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এর একটি অংশ আছে শক্তি রূপে এবং বাকিটা বস্তু রূপে– কারণ আইনষ্টাইনের $E=mc^2$ ফরমুলা অনুযায়ী বস্তুও শক্তিরই একটি রূপ। যে অংশ শক্তি রূপে আছে তা আবার গতি শক্তি (কাইনেটিক এনার্জি) এবং সুপ্ত শক্তি (পোটেনশিয়াল এনার্জি) এই দুভাবে রয়েছে। একটি 'বদ্ধ' সামগ্রিক মহাবিশ্বে এই দুই অংশ সমান। অথচ গতি শক্তি ও সুপ্ত শক্তির একটিকে ধনাত্মক ধরে নিলে অন্যটিকে ঋণাত্মক ধরতে হয়– কাজেই উভয়ের যোগফল শূন্য। শক্তির যে অংশটি বস্তু রূপে রয়েছে তার পরিমাণ mc^2 থেকে পাওয়া যায় (m হলো বস্তুর ভর আর c আলোর গতিবেগ)। স্পষ্টত: এটি ধনাত্মক। কিন্তু এই বস্তুরাজির প্রতিটি অংশ অন্য অংশকে মাধ্যাকর্ষণে পরস্পর আকর্ষণ করে– যেই আকর্ষণ শক্তিটি কিন্তু ঋণাত্মক। একটু ভাবলেই বুঝা যাবে কেন এটি ঋণাত্মক। এই বস্তুর সব কণাগুলো যদি পরস্পর থেকে অসীম দূরত্বে থাকতো তা হলে তাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হতো শূন্য– কারণ এই শক্তি দূরত্বের বর্গের সমানুপাতে কমে যায়, আর অসীম দূরত্বে তা শূন্যতে পর্যবেশিত হয়। এখন পরস্পরের অসীম দূরত্ব থেকে যদি পরস্পরের কাছাকাছি এসে এরা মহাবিশ্বের প্রকৃত অবস্থায় আসে, অর্থাৎ যদি সংকোচিত হয়, তা হলে এর মধ্যে উত্তাপ তৈরি হয়ে তা বেরিয়ে আসবে। বস্তু যে সংকোচিত হলে গরম হয়ে উঠে তা সবার জানা। এভাবে শক্তি ত্যাগ করা মানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এখন পূর্বের শূন্য অবস্থা থেকেও কম– অর্থাৎ ঋণাত্মক। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তু-সমষ্টির মধ্যে মোট মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ঐ বস্তু সমষ্টির শক্তি মানের (mc^2) ঠিক সমান। এদের মধ্যে আমরা দেখলাম প্রথমটি ঋণাত্মক এবং দ্বিতীয়টি ধনাত্মক। কাজেই উভয়ের যোগফল শূন্য। অর্থাৎ মহাবিশ্বের শক্তির যে অংশ বস্তু রূপে আছে তাও সামগ্রিক ভাবে শূন্য। শক্তি রূপে থাকা আর বস্তু রূপে থাকা উভয় অংশই শূন্য হওয়াতে আমরা বলতে পারি মহাবিশ্বের মোট শক্তিই শূন্য। এভাবে দেখানো যায় মহাবিশ্বের ভরবেগও শূন্য।

কৌণিক ভরবেগের কথায় যদি আসি তা হলেও বলতে পারি মহাবিশ্বের সামগ্রিক ভাবে কোন কৌণিক ভরবেগ নাই। যদি থাকতো তা হলে একে একটি অক্ষের উপর ঘুরছে এমন মনে করতে হতো। সে রকম ঘূর্ণায়মান কোন বস্তু তার অক্ষের দিকে অন্য দিকের তুলনায় কম হারে প্রসারিত হওয়ার কথা। প্রসারণ হারের এমন তারতম্য যদি থাকতো তা CMB'র উত্তাপের দিক-নির্ভরতার মাধ্যমে ধরা পড়তো। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি– CMB'র উত্তাপ সবদিকে একেবারে সূক্ষ্মভাবে সমান। কাজেই মহাবিশ্বের কৌণিক ভরবেগও শূন্য। আইনষ্টাইনের তত্ত্ব দেখিয়েছে মহাবিশ্বের কোন সামগ্রিক বৈদ্যুতিক চার্জ নাই। অন্য ধরনের কোন চার্জও নাই।

এই সবকিছু একটি জিনিসই বলে দিচ্ছে– মহাবিশ্বের সব ভৌত সত্ত্বারই মান সামগ্রিক ভাবে শূন্য। এর থেকে অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তে আসতে হয় তা হলো মহাবিশ্বটাই সামগ্রিকভাবে শূন্য। আমরা যেমন দেখেছি আদিতে বিগ ব্যাং এর মুহূর্তে মহাবিশ্ব যদি শূন্য থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে, তাতে তা হলে অসুবিধা কোথায়? শূন্য থেকে শূন্য হওয়া– এর মধ্যে নিত্যতার নিয়মের কোন ব্যত্যয় তো হচ্ছেনা। তাই যাঁরা কিছু নয় থেকে বিশ্বময় সবকিছু এসেছে জেনে অস্বস্তি বোধ করেন, তাঁরা শূন্য থেকে শূন্যই এসেছে– এমন ভাবেও ব্যাপারটিকে ভাবতে পারেন। তবে এগুলো শুধু সন্তোষজনক ভাবে ভাবার ব্যাপারই নয়। কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের সম্মিলিত

পদার্থবিদ্যা আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে বলে দিচ্ছে যে মহাবিশ্ব 'সামগ্রিকভাবে' শূন্য, এবং শূন্য থেকেই তার উৎপত্তি।

গ্যালাক্সি সৃষ্টিরও সুযোগ করে দিয়েছে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন

আমরা দেখেছি CMB-কে বেশ সূক্ষ্ম পরিমাপেও আপাতত যে রকম মসৃণ এবং সর্বত্র সমসত্ত্ব হিসেবে পাওয়া গেছে তাতে গ্যালাক্সি, তারারাজি, সৌরমন্ডল, আমরা– কারো সৃষ্টি হবার কথা নয়। কারণ CMB ওরকম মসৃণতার অর্থ হলো অতীতেও মহাবিশ্বের উত্তাপ ও ঘনত্ব সর্বত্র একেবারে সমসত্ত্ব ছিল। তেমনটি হলে এর মসৃণভাবে ছড়ানো বস্তু কোথাও জমতে শুরু করে গ্যালাক্সি তৈরির সূচনা করতে পারতোনা। কিন্তু আমরা দেখেছি পরে COBE উপগ্রহের গবেষণায় CMB'র ঐ মসৃণতার মধ্যেও আবিস্কৃত হয়েছে সূক্ষ্ম তারতম্য বা আদিতে প্রথম গ্যালাক্সি সৃষ্টির যুগে বস্তুঘনত্বের যথাযথ তারতম্যের ইঙ্গিতবাহী, যার ফলে বস্তু তারাতে ও গ্যালাক্সিতে জমাট বাঁধা শুরু করতে পেরেছিলো। কিন্তু ঐ আদি তারতম্যগুলো আসলো কোথা থেকে, এ প্রশ্নটি কিন্তু থেকে যায়।

গ্যালাক্সি সৃষ্টি কালে আমরা ব্যাপারটিকে দেখছি মহাস্ফীতির অনেক পরে তখন মহাবিশ্ব প্রসারণের ফলে অনেক বড় হয়েছে। সেই সঙ্গে তারতম্যগুলোও বড় হয়ে বস্তুঘনত্বের শুরু করতে পেরেছে। তারো আগে যদি চলে যাই মহাস্ফীতির পর পর অর্থাৎ বিগ্ ব্যাং এর $১০^{-৩২}$ সেকেন্ড পর, তখনো তারতম্যগুলো যথেষ্ট বড়ই বলতে হবে কারণ মাত্র শ'তিনেক গুণ বিবর্ধিত করলে ঘনত্ব তারতম্যগুলো ওর মধ্যে আমরা চোখেই দেখতে পারতাম। কিন্তু তার আগে, মহাস্ফীতির আগে? তখন তো মহাবিশ্ব নিজেই একেবারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। কিন্তু তারতম্যগুলোর বীজ তো তার মধ্যেও থাকতে হবে। এখন মনে করা হচ্ছে ঠিকই তারতম্যের সে বীজ বিশ্বসৃষ্টির মুহূর্তেই ছিল–আর তা হচ্ছে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন। এই ফ্লাকচুয়েশন অর্থাৎ কোয়ান্টাম ফেনার বুদবুদের সৃষ্টি সমসত্ত্ব ভাবে নিয়ম করে ঘটেনা– অনিশ্চয়তার মধ্যে ইতস্তত ঘটে, এটিই তার বৈশিষ্ট। এগুলোই তাই হতে পেরেছে তারতম্যের বীজ। মহাস্ফীতির কবলে পরে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে এগুলোই শেষে বস্তু দানা বাঁধার সূচনা বিন্দু হিসাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অদৃশ্য বস্তু, অদৃশ্য শক্তি

বদ্ধ, খোলা, ও সমতল মহাবিশ্ব

মহাবিশ্ব জন্মের পর থেকে ক্রমাগত প্রসারিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। প্রশ্ন হলো এই প্রসারণ কি অসীম সময় ধরে চলতেই থাকবে, নাকি এক সময় প্রসারণ শেষ হয়ে সংকোচন শুরু হবে। এভাবে প্রসারণ শেষ হয়ে সংকোচনের প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ মহাস্ফীতির ক্ষণিকের সময়টি বাদ দিলে মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটেছে মহাকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে গিয়ে, যেই বল বিশ্বের নানা অংশকে পরস্পরের কাছে নিয়ে এসে একে বরং সংকোচিত করতে চায়। ব্যাপারটি পৃথিবী থেকে কোন কিছু উপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়ার মতো– সেটি একটি ঢিল হতে পারে, একটি রকেটও হতে পারে। যা ছুঁড়ে দেয়া হলো তাকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে থেকেই উপরে যেতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তার দুটি পরিস্থিতি হতে পারে। প্রথমটিতে কিছুদূর উঠার পর বস্তুটির গতি মাধ্যাকর্ষণের কাছে হার মেনে এটি পৃথিবীতে পড়ে যাবে– কারণ মাধ্যাকর্ষণের ফলে তার উর্দ্ধমুখি গতিবেগ ক্রমেই কমতে থাকবে। অধিকাংশ নিক্ষিপ্ত বস্তু– ঢিল বা সাধারণ রকেটের ক্ষেত্রে তাই ঘটবে। কিন্তু উর্দ্ধমুখি নিক্ষেপের গতি যদি পৃথিবীর থেকে নিষ্ক্রমণ বেগ বা সেকেন্ডে ১১ কিলোমিটারের বেশি হয়, তা হলে এটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হবে। সেটিই তার দ্বিতীয় পরিস্থিতি– যা মহাশূন্যযানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কোন কিছু বিস্ফোরিত বা প্রসারিত হবার ক্ষেত্রেও এমনই দুটি পরিস্থিতি হবে। হয় কিছু সময় প্রসারিত হবার পর আবার সংকোচিত হবে নিজের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে; অথবা প্রসারণগতি একটি সংকট গতি থেকে বেশি হলে তা ক্রমেই প্রসারিত হতে থাকবে অসীম ভাবে। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও এই দুই সম্ভাবনাই রয়েছে।

তবে ঐ দুটি পরিস্থিতির ঠিক মাঝামাঝি মধ্যবর্তী আরো একটি পরিস্থিতি হতে পারে– যাকে বলা হয় সংকট অবস্থা। এতে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতেই থাকবে এমন যে রকম বলা যাবে না, তেমনি এটি আবার সংকোচিত হতে আরম্ভ করবে তাও বলা যাবেনা। পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রমণ বেগের এক্কেবারে সমান বেগে কোন কিছু ছুঁড়ে দিলে তাও এরকম সংকট অবস্থায় থাকবে– পৃথিবীতে আবার পড়ে যাবে, না কি এর মায়া কাটিয়ে মহাশূন্যে যাবে, কোনটিই বলা যাবেনা। অদ্ভুত ব্যাপার হলো সব সাক্ষ্যপ্রমাণ বলছে মহাবিশ্ব এমনি সংকট পরিস্থিতির অত্যন্ত কাছাকাছি রয়েছে– এবং তা এ সংকটের কোন দিকে রয়েছে– আদৌ চিরকাল প্রসারিত হবে, নাকি এক পর্যায়ে গিয়ে সংকোচিত হতে থাকবে– তা বলা

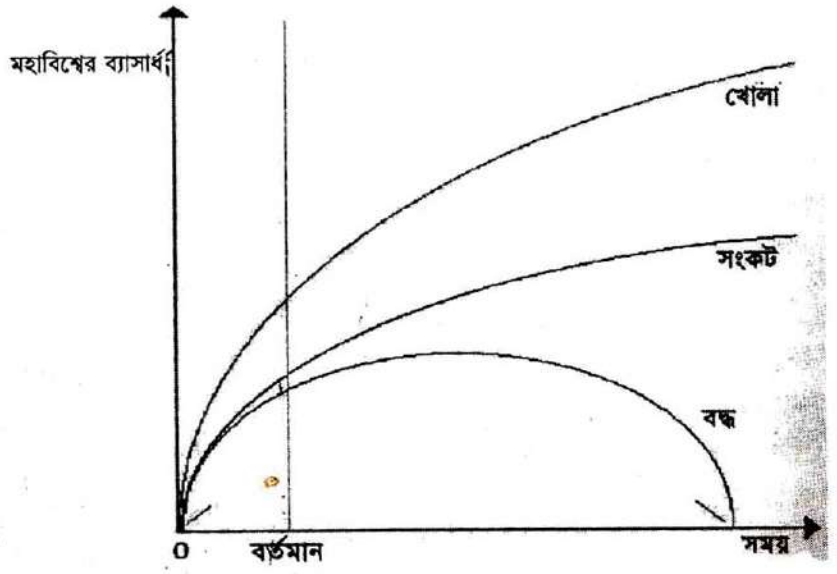

সম্ভব নয়। অর্থাৎ মহাবিশ্বের পরিণতি যে কী হবে তা বলা যাচ্ছেনা, মহাবিশ্বের নিজের অমোঘ পরিস্থিতির কারণেই।

মহাবিশ্বের সংকট পরিস্থিতিতে থাকার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে তার আকৃতি, অর্থাৎ তার স্থান-কালের বক্রতা। আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্বে দেখিয়েছেন কী ভাবে মহাবিশ্ব স্থান-কালে গড়া, এবং কীভাবে তার মধ্যে থাকা বস্তুর পরিমাণের উপর নির্ভর করে এই স্থান-কালের বক্রতা বিভিন্ন হতে পারে। এ বক্রতা ধনাত্বক হতে পারে। কোন রেখার ক্ষেত্রে আমরা ধনাত্বক বক্রতা বলি যদি রেখাটি নিজের দিকে নিজে বেঁকে গিয়ে একটি বৃত্তের আকৃতি নেয়। কোন তলের ক্ষেত্রে আমরা ধনাত্বক বলি যখন তলটি নিজের দিকে নিজে বেঁকে গিয়ে একটি গোলকের আকৃতি নেয়– যেমন একটি ফুটবলের বা বেলুনের ক্ষেত্রে হয়। সেক্ষেত্রে তার একটি সুনির্দিষ্ট আয়তন হয়– বৃত্তের বা গোলকের ক্ষেত্রে যা হয়। এরকম ধনাত্মক বক্রতার জিনিসকে আমরা বলি বদ্ধ (ক্লোজ্‌ড)। একমাত্রিক রেখার ক্ষেত্রে বা দ্বিমাত্রিক তলের ক্ষেত্রে আমরা যা দেখেছি, তা চার মাত্রিক স্থান-কালের ক্ষেত্রেও হতে পারে। মহাবিশ্বের স্থান-কালও হতে পারে ধনাত্বক বক্রতার কারণে বদ্ধ। গত অধ্যায়ে শূন্য মান প্রমাণ করতে গিয়ে আমরা এরকম বদ্ধ বিশ্বের কথাই ধরে নিয়েছিলাম। আমরা চারমাত্রিক আকৃতিকে সহজে চিত্রায়িত করতে পারিনা বলে ফুটবলের দ্বিমাত্রিক তলের হিসাবেই তাদের আপাতত ভেবে নেয়া সহজতর। মহাবিশ্ব যদি এরকম বদ্ধ আকৃতির হয়, তা হলে এক পর্যায়ে গিয়ে তাকে সংকোচিত হতে হবে।

মহাবিশ্বের বক্রতা ধনাত্মক না হয়ে ঋণাত্মকও হতে পারে। সেক্ষেত্রে এর আকৃতি হবে খোলা (ওপেন)। এক মাত্রিক রেখার ক্ষেত্রে আকৃতিটি হবে একটি হাইপারবোলা বা অধিবৃত্তের মত– যেটি বৃত্তের মত নিজের উপর নিজে বদ্ধ নয়, একদিকে বাড়াতে থাকলে ক্রমে প্রসারিত হয়– এর আয়তন সুনির্দিষ্ট করা যায়না। দ্বিমাত্রিক তলের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ হবে আরোহী বসার জন্য ঘোড়ার পিঠে ব্যবহার করা জিনের মতো, অথবা

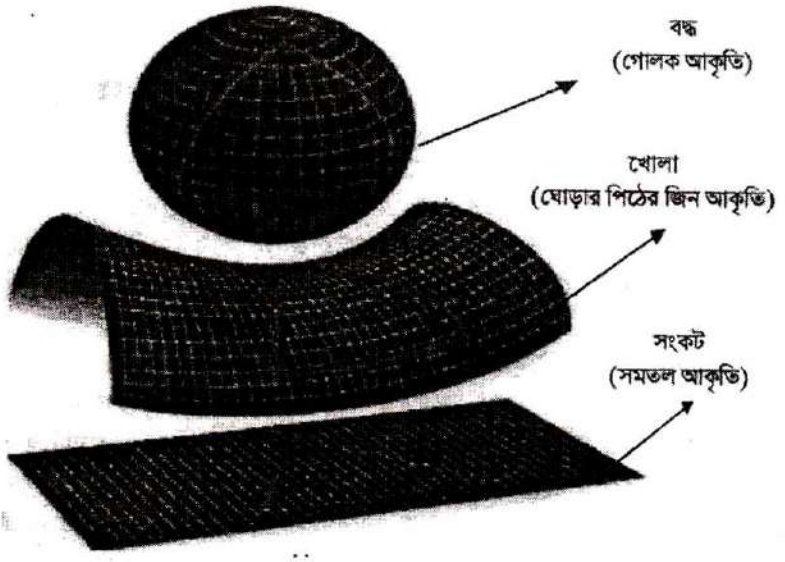

মহাবিশ্বের সম্ভাব্য আকৃতি (দ্বিমাত্রিক রূপে দেখা)

হাইপারবোলা থেকে যে বাটি আকৃতির তল সৃষ্টি করা যায় তার মতো। অবশ্য মহাবিশ্ব নিজে চারমাত্রিক। স্পষ্টত: মহাবিশ্বও যদি এরকম খোলা আকৃতির হয় তা হলে তা চির প্রসারমান হবে।

কিন্তু মহাবিশ্বের আকৃতি যদি পুরোপুরি ধনাত্মক বা পুরোপুরি ঋণাত্মক না হয়ে ঠিক মাঝামাঝি হয় তা হলে সেই সংকট পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ধনাত্মক সংখ্যা আর ঋণাত্মক সংখ্যার মাঝামাঝি যেমন শূন্য থাকে যা এর কোনটিই নয়– এও অনেকটা সে রকম আর কি। সেই সংকটের পরিস্থিতিতে আকৃতিটি কী রকম হবে? তা বদ্ধও হবেনা (দ্বিমাত্রিক উপমায় ফুটবলের মত), খোলাও হবেনা (দ্বিমাত্রিক উপমায় ঘোড়ার পিঠে জিনের মত), তা হবে এ দুইয়ের মাঝামাঝি এদিকেও বাঁকা নয়, ওদিকেও বাঁকা নয়, কাজেই সমতল– দ্বিমাত্রিক উপমায় তক্তার মত।

আগেই বলেছি আইনষ্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের আকৃতি নির্ভর করে তার মধ্যে থাকা বস্তুর পরিমাণের উপর। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে এটি নির্ভর করে এর ইতিহাসের এক একটি সময়ে সামগ্রিকভাবে তার বস্তু-ঘনত্বের উপর। মহাবিশ্বকে বদ্ধ হতে হলে তার আজকের বস্তু-ঘনত্ব একটি সুনির্দিষ্ট সংকট-মাত্রার বেশি হতে হবে। একে খোলা হতে হলে বস্তু-ঘনত্ব এই মাত্রা থেকে কম হতে হবে। আর সমতল বা সংকটের অবস্থায় থাকতে হলে তাকে হুবহু ঐ সংকট-মাত্রার বস্তু-ঘনত্বে থাকতে হবে। আমরা দেখবো নানা কারণে মহাবিশ্বকে সংকট অবস্থায় আছে এমন মেনে নেয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। তাই এতে সামগ্রিকভাবে বস্তু-ঘনত্ব ঐ নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকতেই হবে। পরিমাপে তা না পাওয়া গেলে সব তত্ত্বকে ঠিক ঠাক রাখা সম্ভব হবেনা।

গত অধ্যায়ে মহাবিশ্বের সামগ্রিক মানকে শূন্য প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদেরকে একে বদ্ধ বলে ধরে নিতে হয়েছিল। সংকট অবস্থায় থাকার সুবিধা হলো এটি বদ্ধ অবস্থা বা

খোলা অবস্থা উভয়ের এত কাছাকাছি যে প্রয়োজনমত একে বদ্ধও ধরে নেয়া যায় ঐ আসন্ন মানে, আবার প্রয়োজনমত খোলাও ধরে নেয়া যায়।

মহাবিশ্বের সংকট অবস্থা কেন মেনে নিতে হচ্ছে ?

সৃষ্টির পর ১৪শত কোটি বছর ধরে প্রসারিত হবার পর আজও মহাবিশ্ব খুব সুনির্দিষ্ট ভাবে একই ঘনত্ব বজায় রেখে সংকট অবস্থার কাছাকাছি থাকাটি আপাতদৃষ্টিতে বেশ অস্বাভাবিক। কারণ সুদূর অতীতে, সৃষ্টির মুহূর্তে, এমন সংকট অবস্থায় থাকলেও যতই দিন গেছে প্রসারিত হতে গিয়ে এই সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি থেকে ক্রমে সরে সরে এর এতদিনে বদ্ধ অথবা খোলা এই দুইয়ের যে কোন একটি দিকে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি, আজ এত দীর্ঘ সময় পরও মহাবিশ্ব সংকট অবস্থার এদিকে বদ্ধ হওয়ার দিকে আছে, না ওদিকে খোলা অবস্থার দিকে তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। এমনটি হতে পারে একমাত্র শুরুতে মহাস্ফীতির সময় এর প্রসারণ গতি এক্কেবারে ঠিক সংকট অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় মানে থাকলে– সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে সে গতির $১০^{৩৬}$ ভাগের এক ভাগের মধ্যে থাকলে! ঐ টুকুর চেয়ে বেশি বিচ্যুতি থাকলে আজকের মহাবিশ্ব আমরা পেতামনা।

হিসেবে দেখা যায় এর থেকে একটুকুও বেশি গতিতে মহাবিশ্ব যদি প্রসারণ শুরু করতো তা হলে যে ধরনের ক্ষুদ্র অসমতা তার ঘনত্বের মধ্যে রয়েছে তার থেকে গ্যালাক্সির প্রারম্ভ ঘটতে পারতোনা। ফলে বস্তুপুঞ্জ দানা বাঁধতে পারতোনা– তারা গ্রহ ইত্যাদি সৃষ্টি হতোনা, আমরাও আসতামনা। সে অবস্থায় ঐ প্রারম্ভের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যাকর্ষণের জোর প্রসারণের উচ্চ গতির কাছে হার মানতো। আমাদের এবং সকল জীবের দেহ যে সব মৌল দিয়ে তৈরি সেগুলোও সৃষ্টি হতে পারতোনা– কারণ সেগুলো সৃষ্টি হতে পারে একমাত্র তারার অভ্যন্তরে অথবা তারার বিস্ফোরণে– যা আমরা দেখেছি।

আর মহাবিশ্বের শুরুর গতি যদি সংকটের অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় গতির চেয়ে একটুকুও কম হতো তা হলে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব এর বস্তুর উপর এতখানি হতো যে তারা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার বহু আগেই মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হয়ে যেত এবং মহাবিশ্ব সংকোচিত হবার দিকে চলে যেত। তা হলে এর ইতিহাস উল্টো দিকে যেত– আমরা আসার মত পরিস্থিতি এক্ষেত্রেও সৃষ্টি হতোনা। কাজেই যেন আমাদের আসার সুবিধার জন্যই মহাবিশ্বকে সব সময় সংকট অবস্থার খুব কাছাকাছি থাকতে হয়েছে, এর আকৃতিকে থাকতে হয়েছে দ্বিমাত্রিক উপমায় সমতলের খুব কাছাকাছি– ফুটবলের মত গোলকাকার বা বদ্ধ নয়, ঘোড়ার জিনের আকারে খোলাও নয়। আসলে আমাদের সব সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সঠিক হবার জন্যই এমনটি দরকার।

আমরা দেখেছি আমাদের তত্ত্বের জন্য ঠিক ঐ সময়, ঠিক ঐ স্থায়ীত্বে, ঠিক ঐ পরিমাণে মহাস্ফীতি হওয়াটি কেন এত জরুরী। মহাস্ফীতি না হলে মনোপোল সমস্যার সমাধান হবেনা, এখন মহাবিশ্বে প্রতিবস্তু না থাকার সমস্যাও সমাধান হবেনা। তাছাড়া বিগ ব্যাং এর পর $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ডের মত আদি সময়েও মহাবিশ্বকে ৩ মিলিমিটার ব্যাসের 'অতি বিশাল' বলে ধরে নিতে হতো, যে কারণে আলো বা অন্য কোন সিগন্যাল নিজ গতিতে ঐ সময় এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকেও যোগাযোগে রাখতে পারতোনা– ফলে তার পক্ষে সমসত্ত্ব হওয়াও সম্ভব হতোনা। এরকম অনেকগুলো গুরুতর সমস্যার সমাধান এনে

দিয়েছে মহাস্ফীতির ধারণা। আর এই মহাস্ফীতিই শুরুতেই মহাবিশ্বকে এমন নিঁখুতভাবে সমতল চেপ্টা আকৃতি দিয়ে দিয়েছে যে পরে তার থেকে ব্যত্যয় হবার আর সুযোগ হয়নি– সব সময়েই মহাবিশ্ব সংকট অবস্থার অতি কাছে থেকে গেছে, অন্তত এর থেকে দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ পরিমাণও দূরে যেতে দেয়নি। কীভাবে ওরকম সমতল করেছে তাও একটি উপমা দিয়ে বুঝানো যায়। মহাস্ফীতির আগের ক্ষণিক সময়ের জন্য এটি যদিও বা ক্ষুদ্র বুদবুদের মতো বদ্ধ গোলকাকৃতিতে থেকেও থাকতো, মহাস্ফীতির সময় তা ফেঁপে ফুলে অনেক অনেক গুণ বড় হয়ে যাওয়াতে এর সর্বত্র প্রায় নিঁখুত সমতলে পরিণত হতো। একটি ছোট বেলুনকে যদি হঠাৎ করে ফুলিয়ে পৃথিবী বা তারো চেয়ে বড় গোলকে পরিণত করা হয় তা হলে তার সব অংশ কার্যত সমতল তো হবেই। কাজেই মহাস্ফীতি যদি মহাবিশ্বের ইতিহাসে অত্যাবশ্যকীয় হয়, তা হলে সমতল বা সংকটে থাকাটিও এর জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

তা ছাড়া আজ সংকটাবস্থায় আছে কি নাই তা তো মহাবিশ্বের প্রসারণের প্রকৃতি থেকেই বুঝা যায়। প্রসারণের গতি বদ্ধ অবস্থার অনুকূল, না খোলা অবস্থার অনুকূল, না কি এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থার অনুকূল, তা মহাবিশ্বের নানা অংশের প্রসারণ গতি মেপে আন্দাজ করা যায়। আলোর ডপলার সরণ মেপে এটি যে করা যায় তা আমরা আগেই দেখেছি। এই পদ্ধতিতে মহাশূন্যের নানা অংশের প্রসারণে ব্যাপক জরীপ চালানো হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে তা সংকটাবস্থায় থাকারই অনুকূল।

প্রশ্ন হলো মহাবিশ্বে এত বস্তু আছে কিনা

সংকট অবস্থায় থাকার অর্থ হলো মহাবিশ্ব বদ্ধ হবার খুবই কাছাকাছি রয়েছে। এর জন্য একটি ন্যূনতম বস্তু-ঘনত্ব থাকতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু মহাবিশ্বের সকল দৃশ্যমান বস্তুর গড়পড়তা যে ঘনত্ব পরিমাপে পাওয়া যাচ্ছে– তা এ জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে দৃশ্যমান কথাটির অর্থ হলো টেলিস্কোপে, রেডিও টেলিস্কোপে, বা এমনিতরো নানা পদ্ধতিতে যাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব তার সব। পরিমাপে এর ঘনত্ব যে শুধু অল্পবিস্তর কম পড়ছে তা নয়, বরং সংকট অবস্থায় থাকতে হলে মহাবিশ্বে এর থেকে অন্তত দশগুণ বেশি বস্তু-ঘনত্ব থাকা চাই, কোন কোন হিসাবে অন্তত একশ' গুণ বেশি থাকা চাই। বস্তু-ঘনত্ব এত গুণে বেশি থাকার একটিই উপায়– ধরে নেয়া যে মহাবিশ্বে দৃশ্যমান হবার যোগ্য সাধারণ যত বস্তু রয়েছে তার থেকে অনেক গুণ বেশি এমন কোন বস্তু রয়েছে যা দৃশ্যমান হবার যোগ্য নয়। বিজ্ঞানীরা বাধ্য হয়ে এমন বস্তু কল্পনা করে তার নাম দিয়েছেন ডার্ক ম্যাটার বা অদৃশ্য বস্তু।

শুধু কল্পনা করলেই তো হবেনা, দেখতে না পারলেও অদৃশ্য বস্তু যে রয়েছে তার পরোক্ষ প্রমাণ অন্তত পেতে হবে। যতই গবেষণা হলো সে প্রমাণ ততই পাওয়া গেল। বরং বুঝা গেল ওরকম অদৃশ্য বস্তু না থাকলে আমাদের সরাসরি পর্যবেক্ষিত আরো কিছু কিছু জিনিসের ব্যাখ্যাই করা যায়না, বিশেষ করে গ্যালাক্সিতে তারার কোন কোন গতিবিধির। এমনি একটি হলো চাকতি আকৃতির চেপ্টা গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে চাকতির সমতল থেকে তারাদের বাইরে যাওয়ার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ। গ্যালাক্সির সাধারণ গতিবিধির মধ্যে এটি দেখা যায়। গ্যালাক্সির চেপ্টা সমতল থেকে এ ভাবে তারা একটি বিশেষ দূরত্ব পর্যন্তই

শুধু সরতে পারে, তার বেশি নয় কারণ গ্যালাক্সির সামগ্রিক মাধ্যাকর্ষণ বল তাকে ঐ সমতলে টেনে রাখতে চায়। তল থেকে কত দূরে গিয়ে তারাকে এভাবে থাকতে হয় সেই পরিমাপ থেকে বুঝা যায় গ্যালাক্সির সামগ্রিক মাধ্যাকর্ষণ বল কত, এবং তার থেকে জানা যায় গ্যালাক্সির বস্তুর পরিমাণ কত। এই হিসাবমত যে ধরনের বস্তু-ঘনত্ব প্রয়োজন তা কিন্তু গ্যালাক্সিতে দৃশ্যত নাই– প্রয়োজনীয় মাধ্যাকর্ষণ পেতে হলে এতে প্রচুর অদৃশ্য বস্তুর বাড়তি উপস্থিতি ধরে নিতে হবে।

গ্যালাক্সির কেন্দ্র অঞ্চল খুবই উজ্জ্বল কারণ এখানে দৃশ্যমান (উজ্জ্বল) বস্তুর ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। সেই তুলনায় গ্যালাক্সির কিনারা বলতে গেলে অন্ধকারে। দৃশ্যমান উজ্জ্বল বস্তুই যদি গ্যালাক্সির একমাত্র বস্তু হয়ে থাকে তা হলে কিনারায় বস্তু ঘনত্বও একইভাবে অনেক কম হওয়ার কথা। ফলে কিনারার মাধ্যাকর্ষণ বলও কম হবে। গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারিদিকে সব তারা যে প্রবল বেগে পরিক্রমণ করে তা কাছাকাছি তারাগুলোর পরস্পর মাধ্যাকর্ষণের উপর নির্ভর করে। মাধ্যাকর্ষণ কম হওয়ার কারণে কিনারার তারাগুলোর পরিক্রমণ গতি তাই কেন্দ্রীয় তারাগুলোর চেয়ে কম হবার কথা। বাস্তবে কিন্তু তা হয়না। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে গ্যালাক্সিতে তারাগুলোর পরিক্রমণবেগ কেন্দ্র থেকে সব দূরত্বে একই– কেন্দ্রীয় অঞ্চলে যা, কিনারায়ও তাই। তার মানে বস্তু-ঘনত্ব সব জায়গায় একই, যদিও কিনারায় দৃশ্যমান বস্তু অনেক কম। এর ব্যাখ্যাও সেই একই– গ্যালাক্সির অন্ধকার কিনারায় বা তারও বাইরে প্রচুর অদৃশ্য বস্তু রয়ে গেছে।

অদৃশ্য বস্তুর উপস্থিতি পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ার আরো একটি ক্ষেত্র উল্লেখ করতে পারি। আমরা শুরুতেই দেখেছি যে মহাবিশ্বের যে প্রসারণ তা গ্যালাক্সি, এমনকি গ্যালাক্সিপুঞ্জের ক্ষেত্রেও ঘটছে না। কারণ এসব পর্যায়ে পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণের জোর প্রসারণের জোরের চেয়ে বেশি। প্রসারণটি হচ্ছে আরো বৃহত্তর পর্যায়ে– গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জের পর্যায়ে। সেই পর্যায়ে পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণ অতি দুর্বল। কিন্তু সৃষ্টির আদি মুহূর্ত থেকে আসা বস্তুর সূক্ষ্ম ঘনত্ব তারতম্য কিন্তু এই পর্যায়েও বলবৎ রয়েছে। ফলে আমাদের থেকে অনেক সুদূর সেই মহাপুঞ্জ পর্যায়েও বস্তু-ঘনত্ব কোথাও সামান্য বেশি বলে সেখানে বস্তু পরস্পর আকর্ষিত হচ্ছে। আবার ঘনত্ব কোথাও তুলনামূলক ভাবে কম বলে বস্তু সেখানে পরস্পর বিকর্ষিত হচ্ছে, কারণ অন্যদিকে অন্যবস্তুর আকর্ষণ বস্তুকে সেদিকে নিয়ে গেলে পূর্ব ক্ষেত্রে তা বিকর্ষণের মত মনে হবে। এভাবে ঐ পর্যায়েও নানা অঞ্চলে প্রসারণের ক্ষেত্রে সামান্য বৈষম্য দেখা দেয়– যদিও অবশ্য সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বের প্রসারণ খুবই সুসম। আমরা রেডশিফ্টের (লাল সরণ) সূক্ষ্ম পরিমাপের মাধ্যমে এই প্রসারণ বৈষম্যগুলো জানতে পারি। এভাবে অনেক দূরের গ্যালাক্সিগুলোতে রেডশিফ্ট ম্যাপিং করে এবং তার থেকে সেখানকার বস্তু-ঘনত্বের তারতম্যগুলো নির্ণয় করে দেখা গেছে যে দৃশ্যমান বস্তুর নিরিখে এ হিসাব মেলেনা– এর জন্যও প্রচুর অদৃশ্য বস্তুর প্রয়োজন হয়। কাজেই আমাদের এসব নানা পর্যবেক্ষণও অদৃশ্য বস্তুর উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তুলেছে।

এরা অদৃশ্য থাকা সাধারণ বস্তু কেন নয়?

স্বাভাবিক ভাবে মনে হতে পারে আমাদের দেখার যন্ত্রপাতির দক্ষতার অভাবে খুবই নিষ্প্রভ অনেক বস্তুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না– তাই এগুলোকে অদৃশ্য বস্তু বলছি। সেক্ষেত্রে অদৃশ্য বস্তু আমাদের পরিচিত সাধারণ গ্যাস, ধূলি বা তারার ভেতরের বস্তু।

এমনটি যদি হতো তা হলে অদৃশ্য বস্তু এতখানি গুরুত্ব বহন করতোনা। কিন্তু বিগ্ ব্যাং তত্ত্বের কিছু মূল শর্তই বলে দিচ্ছে এই অদৃশ্য বস্তু সাধারণ বস্তু হতে পারেনা। আমরা দেখেছি বিগ্ ব্যাং তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পেছনে যে অকাট্য সাক্ষ্যগুলো পাওয়া গেছে তার মধ্যে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেনের সুনির্দিষ্ট অনুপাত অন্যতম। তাছাড়া এদের সঙ্গে হিলিয়াম^3 নামে পরিচিত হিলিয়ামের অন্য আইসোটাপ এবং হাইড্রোজেনের অন্য আইসোটোপ ডিউটেরিয়ামের অনুপাত আরো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিগ্ ব্যাং-এর ১০০ সেকেন্ড নাগাদ পরই যে এই অনুপাতগুলো সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তা আমরা বিগ্ ব্যাং পরবর্তী প্রক্রিয়ার মধ্যেই দেখেছি। সে সময় নিউট্রনের প্রোটনে পরিণত হবার প্রবণতাটি বন্ধ হয়ে নিউট্রন আর প্রোটনের অনুপাত স্থির হয়ে গিয়েছে। আর সেটাই ঠিক করে দিয়েছিল হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, হিলিয়াম^3, ডিউটেরিয়াম এবং লিথিয়ামের অনুপাত। অবাক ব্যাপার হলো চৌদ্দ শত কোটি বছর পরেও আমরা এই একই অনুপাত বাস্তবে দেখছি। এই অনুপাতটিকে তাত্ত্বিক ভাবে ভবিষ্যৎদ্বাণী করতে পারাটি বিগ্ ব্যাং তত্ত্বের একটি বড় সাফল্য। এই ব্যাপারে অনুপাতগুলো খুবই সংবেদনশীল– আজকের পর্যবেক্ষিত অনুপাতে সামান্যতম গরমিলও যদি দেখা যায় তা হলেই বিগ্ ব্যাং এর পক্ষে যুক্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এরমধ্যে হিলিয়াম^3 ও ডিউটেরিয়ামের অনুপাতটি বিশেষভাবে সংবেদনশীল।

এখন যদি বলা হয় অদৃশ্য বস্তুও আমাদের পরিচিত সাধারণ বস্তুর মতই অর্থাৎ– প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনে গড়া– তাহলে সমস্যা দেখা দেবে। মহাবিশ্বে নিউট্রনের পরিমাণ ঐ বিগ্ ব্যাং পরবর্তী ১০০ সেকেন্ডের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। এই নিউট্রন উপরে উল্লেখিত সব মৌলগুলো সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে শুধু হাইড্রোজেন ছাড়া। অদৃশ্য বস্তু যদি সাধারণ বস্তুই হয় তা হলে তাতেও নিউট্রনের প্রয়োজন হবে প্রচুর– অনেক বেশি সংখ্যায়। আর এই নিউট্রনকেও আসতে হবে সেই আদি নিউট্রনগুলো থেকেই যেখানে বিগ্ ব্যাং এর পর পর নিউট্রন আর প্রোটনের অনুপাত ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এ কাজে এত নিউট্রন যোগান দিতে হলে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, হিলিয়াম^3, ডিউটেরিয়ামের পারস্পরিক অনুপাত একেবারে বদলে যাবে। সেক্ষেত্রে বিগ্ ব্যাং-এর সপক্ষের ঐ বড় প্রমাণটি আর টিকবেনা। কাজেই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোর স্বার্থেই অদৃশ্য বস্তু প্রোটন-নিউট্রন-ইলেকট্রনে তৈরি সাধারণ বস্তু হতে পারেনা। তাকে অন্য কোন রকম বস্তু হতে হবে, যাদের এখনো আমরা চিনিনা।

অদৃশ্য বস্তুর স্বরূপ

অদৃশ্য বস্তু হতে পারে এরকম বেশ কিছু সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এর জন্য ব্ল্যাক হোলের কথা মনে হতে পারে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর থেকেই এর বেশ কিছু বস্তুর পরিণতি হয়েছে ব্ল্যাক হোলে। এখানে বস্তু অত্যন্ত ঘন হয়ে এতো মাধ্যাকর্ষণ অর্জন করেছে যে এর কিনারায় একটি সীমা পর্যন্ত জায়গার মধ্যে যা কিছু আছে তাই আকৃষ্ট হয়ে হারিয়ে যাবে, আলোও যার অন্তর্গত। কাজেই এ বস্তু থেকে আলো কখনোই আমাদের কাছে পৌঁছবেনা বলে এরা অদৃশ্য– ব্ল্যাক হোল। সেই হিসাবে ব্ল্যাক হোলই হতে পারতো আমাদের অদৃশ্য বস্তু। মহাবিশ্বে যে ব্ল্যাক হোলের কথা

আমরা জানি তা প্রধানত দুভাবে সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত আদি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অতি ঘন পুঞ্জীভূত অংশে যাদের অস্তিত্ব আমরা সুদূর কোয়াজার থেকে জানি। আর দ্বিতীয়ত তারা যখন শেষ বয়সে নিজের উপর ধসে পড়ে অতি ঘন হয়ে একই রকম অবস্থার সৃষ্টি করে ব্ল্যাক হোল সৃষ্টি করে। কিন্তু মুশকিল হলো এই দুই রকম ক্ষেত্রেই ব্ল্যাক হোল সৃষ্টি হয়েছে নিউট্রন-প্রোটন অনুপাত সুনির্দিষ্ট হবার পর। কাজেই ঐ নিউট্রন–প্রোটনে গড়া সাধারণ বস্তুই ব্ল্যাক হোলের রূপ ধারণ করছে। আর ঐ নিউট্রন-প্রোটন আসছে বিগ্ ব্যাং এ সুনির্দিষ্ট হিসাবের মধ্য থেকেই। কাজেই উল্লিখিত কারণে এদেরকে আমাদের প্রয়োজনীয় অদৃশ্য বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা যায়না। অবশ্য যদি নিউট্রন-প্রোটনের অনুপাত সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবার আগে, অর্থাৎ হাইড্রোজেন হিলিয়াম ইত্যাদির অনুপাত ঠিক হয়ে যাওয়ার আগে, ব্ল্যাক হোল সৃষ্টির কোন সুযোগ থাকে তাহলে তাকে এই অদৃশ্য বস্তু হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবে মহাবিশ্বের ইতিহাসে এতটা আদি সময়ের যে কোন ব্ল্যাক হোলকে খুউব ক্ষুদ্র হতে হবে। বিগ্ ব্যাং এর মুহূর্তের কাছাকাছি এরকম ব্ল্যাক হোল সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু তত্ত্ব থাকলেও সেগুলো খুব বেশি উন্নত হয়নি, সাক্ষ্য প্রমাণেও সমর্থিত হয়নি।

অদৃশ্য বস্তু হবার জন্য আরো গ্রহণযোগ্য প্রার্থী হলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু-কণিকা নিউট্রিনো। মহাশূন্য সৃষ্টির সময় নিউট্রন যখন প্রোটনে পরিণত হচ্ছিল সেই বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে নিউট্রিনোও তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া সুপারনোভা হিসাবে তারা বিস্ফোরণের সময়ও প্রচুর নিউট্রিনো তৈরি ও নির্গত হয়। নিউট্রিনোর ভর অতি নগণ্য, কিন্তু তাকে শূন্য বলা যায়না। বস্তুর সঙ্গে এর বিক্রিয়াও নগণ্য, তাই কোন রকম যন্ত্রের সাহায্যে এর উদ্ঘাটন দুরূহ। এটি বস্তু ভেদ করে চলে যায়। এজন্য এরা অদৃশ্যও বটে! তারপরও যেটুকু সামান্য বিক্রিয়া এর সঙ্গে সম্ভব তাতে অসংখ্য নিউট্রিনোর মধ্যে দু'একটির উদ্ঘাটন ভূপৃষ্ঠের অনেক নিচে স্থাপিত বিশেষ উদ্ঘাটকের মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে। ভূগর্ভে স্থাপনের কারণ হলো যাতে সেখানে মহাকাশ থেকে আসা অন্য কোন কণিকা গিয়ে নিউট্রিনো উদ্ঘাটনে ব্যাঘাত না ঘটতে পারে। শুধু নিউট্রিনোই মাটি শিলা ভেদ করে ভূগর্ভে ঐ যন্ত্রে পৌঁছতে পারে। এই উদ্ঘাটন মহাবিশ্বে প্রচুর নিউট্রিনোর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। যেমন সুপারনোভার বিস্ফোরণের উজ্জ্বল আলো দেখা যাবার ঠিক আগে আগেই সেখান থেকে আসা কিছু নিউট্রিনো এভাবে উদ্ঘাটিত হতে দেখা গেছে– আলোর বেগের খুব কাছের বেগে ওগুলো সুপারনোভার বিস্ফোরণের সাক্ষ্য নিয়ে এভাবে আসে।

একটি তত্ত্ব অনুযায়ী গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জগুলোর মাঝখানের জায়গাগুলো নিউট্রিনোতে ঠাসা। এর কারণ বিগ্ ব্যাং এর সময় অসংখ্য নিউট্রিনো সৃষ্টি হয়ে প্রায় আলোর গতিতে বিশ্বময় একেবারে সুসম ভাবে বন্টিত হয়ে গিয়েছিল। যদিও এক একটি নিউট্রিনোর ভর নগণ্য, এরকম বিপুল পরিমাণ নিউট্রিনোর সামগ্রিক ভর অদৃশ্য বস্তুর দায়িত্ব নেবার মতই যথেষ্ট হতে পারে। অদৃশ্য বস্তুগুলো নিউট্রিনোতে গড়া হবার সম্ভাবনা তাই যথেষ্ট। আর এতে সেই মৌলিক তাত্ত্বিক সমস্যাটি নাই, এটি হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের প্রতিষ্ঠিত অনুপাতকে কোনভাবে প্রভাবিত করবেনা। সাধারণ বস্তুর সঙ্গে তার অমিল অনেক। নিউট্রিনোর কোন চার্জ নাই। এটি বিদ্যুৎ-চৌম্বক কিংবা নিউক্লিয়ার সবল বলে অংশ নেয়না– শুধু নিউক্লিয়ার দুর্বল বল ও মাধ্যাকর্ষণ বলে প্রভাবিত হয়।

এর একটি জোরালো বিকল্প তত্ত্বও রয়েছে যা এসেছে GUT তত্ত্বের থেকে। এতে বিভিন্ন তাত্ত্বিক পূর্বাভাষ থেকে বলা হচ্ছে যে নিউট্রিনো যে রকম অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে কোন বিক্রিয়া প্রায় করেনা বলেই চলে, সেরকম আরো কণিকা রয়েছে যার বিক্রিয়াও নগণ্য। কিন্তু তফাৎ হচ্ছে নিউট্রিনোর যেখানে ভর নগণ্য এই কল্পিত কণিকাগুলোর ভর অত্যন্ত বেশি। তাই এদেরকে বলা হলে উইকলি ইন্টার-এ্যাকটিং ম্যাসিভ পার্টিকেল– সংক্ষেপে WIMP– অর্থাৎ দুর্বল বিক্রিয়াশীল ভারী কণিকা। এগুলোর বাস্তব অস্তিত্বের কোন সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। শুধু তাত্ত্বিক কারণেই এদের উপর বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট আস্থা! মনে করা হচ্ছে যে মহাবিশ্বের আদি অবস্থায় চারিদিকে ডওগচ এর মধ্যে কিছু ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে আমাদের পরিচিত সাধারণ বস্তু (আমরা নিজেরাও) আটকা পড়েছে। WIMP অদৃশ্য, যে অদৃশ্য বস্তুর কথা আমরা বলছি। এজন্যই অদৃশ্য বস্তু সাধারণ বস্তুর তুলনায় এত বেশি। এ তত্ত্বের সমর্থনে একে যাতে বাস্তবে উদ্ঘাটন করা যায় এ জন্য বিজ্ঞানীরা WIMP ধরার জন্য খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেছেন। নিউট্রিনোর উদ্ঘাটকের মতোই মাটির ও শিলার গভীরে এই উদ্ঘাটক যন্ত্র বসিয়ে অপেক্ষা করা হচ্ছে। নিউট্রিনো উদ্ঘাটকের মত এক্ষেত্রেও যন্ত্রগুলা ভূগর্ভে বসাবার কারণ হলো যাতে মহাকাশ থেকে আসা আর কোন কণিকার ভিড়ে WIMP হারিয়ে না যেতে পারে। ভূমি ভেদ করে WIMP কিন্তু সেখানে পৌঁছতে পারবে এর দুর্বল বিক্রিয়ার কারণে। বিজ্ঞানীদের আশা কয়েক বছরের মধ্যেই অন্তত কয়েকটা হলেও WIMP কণিকা ধরা পড়বে। তাছাড়া সুইজারল্যান্ডে CERN ল্যাবোরেটরীর ভূগর্ভে যে বিশাল আয়োজন LHC বা লার্জ হেড্রোন কলাইডারের কথা বলেছি, তাতেও অত্যন্ত উচ্চ শক্তি কণিকা সংঘর্ষের মাধ্যমে এই ভারী অথচ মায়াবী অদৃশ্য কণিকাগুলোকে সৃষ্টি ও উদ্ঘাটন সম্ভব হবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

অদৃশ্য বস্তুগুলো নিউট্রিনো, না WIMP দিয়ে গড়া এই নিয়ে এখনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব রয়েছে। নিউট্রিনোর গতি বেশি তাই এদেরকে বলা হয় হট্ (উত্তপ্ত) বস্তু। আর WIMP ধীর গতির তাই এদেরকে বলা হয় কোল্ড (শীতল) বস্তু। অদৃশ্য বস্তু নিয়ে তাই ঠান্ডা-গরমের লড়াই চলছে। তবে একটি সাম্প্রতিক মডেল অনুযায়ী অদৃশ্য বস্তুর শতকরা সত্তর ভাগই

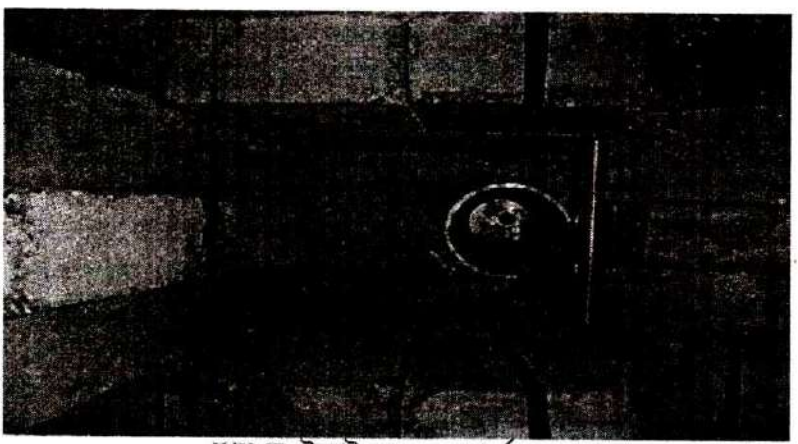

WIMP উদ্ঘাটনের জন্য ভূগর্ভে ব্যবস্থা

WIMP এবং বাকি শতকরা ত্রিশভাগ নিউট্রিনো। আর অদৃশ্য বস্তুর প্রাচুর্যই মহাবিশ্বে অনেক বেশি, সাধারণ বস্তু এর কয়েক শতাংশ মাত্র।

একটি বিষয় বেশ লক্ষণীয়। মহাবিশ্বের গতি প্রকৃতি বুঝার জন্য মানুষ হাজার বছর ধরে এত দিন আকাশের দিকেই তাকিয়েছে। সেখানে সে যা দেখেছে, এবং যা তার শক্তিশালী যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করেছে, সেখান থেকেই এসেছে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের আজকের জ্ঞান। কিন্তু অদৃশ্য বস্তু খুঁজতে গিয়ে এখন আমাদেরকে আকাশমুখি না হয়ে পাতালমুখি হতে হচ্ছে। আমাদের অনেক আশা ভরসা এখন ভূগর্ভে পেতে রাখা যন্ত্রপাতির উপর। মহাবিশ্বের নিউট্রিনো অথবা WIMP এর উদ্ঘাটন হচেছ বা হবে সেখানেই।

অদৃশ্য শক্তি

সম্প্রতি অতি সূক্ষ্ম পরিমাপে দেখা গেছে যে মহাবিশ্বের বয়সের বেশির ভাগ সময় এর প্রসারণের হার ক্রমে বেড়েছে। অথচ স্বাভাবিক প্রত্যাশায় এটি হবার কথা নয়। মহাস্ফীতির ক্ষণিকের সময়টি বাদ দিলে মহাবিশ্বের প্রসারণ হবার কথা বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে। তাই এর প্রসারণ বেগ মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ক্রমেই কমে আসার কথা, খুব ধীরে হলেও। এর আগে আমরা এ প্রক্রিয়াকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়া ঢিলের সঙ্গে তুলনা করেছি, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে যার উর্দ্ধ গতিবেগ ক্রমে কমতে থাকে। পরিমাপলব্ধ এই অবাক করা নূতন আবিষ্কার তাই বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট ভাবিয়েছে। এর অর্থ মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণ শুধু নয়, বরং তাকে অগ্রাহ্য করার মত একটি বিকর্ষণ শক্তি এখানে কাজ করছে যা প্রসারণকে ক্রমাগত দ্রুততর করছে। সাধারণ পরিচিত শক্তি নয় বলে একে বলা হলো অদৃশ্য শক্তি– ডার্ক এনার্জি। দেখা গেছে প্রসারণ সম্পর্কিত নূতন তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে হলে মহাবিশ্বে এই শক্তিরই প্রাধান্য মেনে নিতে হয়। এর পরিমাণ সাধারণ ও অদৃশ্য সব রকম বস্তুর চেয়েও অনেক বেশি। মনে রাখতে হবে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় বস্তু ও শক্তি একই জিনিসের দুই ভিন্ন রূপ মাত্র, কাজেই উভয়ের পরিমাণ একই মাপে তুলনা করা যায়।

মহাবিশ্ব প্রসারণের সাম্প্রতিক পরিমাপগুলোকে অতি নিঁখুত করা সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন বয়সী সুপারনোভা বিস্ফোরণের আপাত ঔজ্জ্বল্য মাপার মাধ্যমে। সুপারনোভার সত্যিকার ঔজ্জ্বল্য সব ক্ষেত্রে সমান ও জানা বলে একে ষ্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেল হিসাব ব্যবহার করা যায় সে কথা আমরা আগেই বলেছি। মাপা আপাত ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেলের তুলনা করে বিভিন্ন কালের সুপারনোভার দূরত্ব ভাল করে জানার ফলে এদের সবার ক্ষেত্রে প্রসারণের গতিও নিঁখুত ভাবে মাপা গিয়েছে হাবলের নিয়ম থেকে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে বিগ ব্যাং এর পর প্রথম সাত শত কোটি বছর প্রসারণ হার ক্রমাগত কমেছে– মাধ্যাকর্ষণের ফলে যেমনটি আশা করা হয়। কিন্তু তারপর থেকে আজ অবধি প্রসারণের হার ক্রমে বেড়েছে। স্পষ্টত মাধ্যাকর্ষণ ও অদৃশ্য শক্তির মধ্যে একটি যুদ্ধ গোড়া থেকেই চলছে। মহাবিশ্বের প্রথম সাত শত কোটি বছর মাধ্যাকর্ষণের জয় হয়েছে। এর পর মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করে এটি মহাবিশ্বকে ক্রমাগত দ্রুততর ভাবে প্রসারিত করেছে। এই গতি প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সর্বাধুনিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে

মহাবিশ্বে অদৃশ্য শক্তির পরিমাণ ৭০%, অদৃশ্য বস্তুর পরিমাণ ২৫%, আর সাধারণ বস্তুর পরিমাণ মাত্র ৪%, বাকি CMB ও অন্য সাধারণ শক্তি। অথচ যেই অদৃশ্য শক্তি মহাবিশ্বের সিংহ ভাগে জুড়ে আছে তার স্বরূপ ও উৎস সম্পর্কে এখনো আমরা খুব কমই জানি।

অদৃশ্য শক্তির স্বরূপ

অদৃশ্য শক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বেশ কিছু তত্ত্ব রয়েছে, কিন্তু কোনটিই পরীক্ষণে প্রমাণিত হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। তবে মহাবিশ্ব প্রসারণের হার বৃদ্ধি ও এর গতি প্রকৃতির পরিমাপ থেকে হিসেব করা কতগুলো গুণাগুণ অদৃশ্য শক্তির থাকতেই হবে। মহাবিশ্বে অদৃশ্য শক্তিকে খুবই সুসম ভাবে বন্টিত থাকতে হবে– সেই হিসাবে পুঞ্জীভূত হয়ে গ্যালাক্সি সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় তার কোন অবদান থাকার কথা নয়। তাছাড়া অদৃশ্য শক্তির ঘনত্বটি খুব কম– প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে (সিসি) মাত্র $১০^{-২৯}$ গ্রামের কোঠায়। এমন পাতলা জিনিসকে ল্যাবোরেটরিতে ধারণ করে পরিমাপ করা দুরূহ হবে। তা ছাড়া মনে হচ্ছে বিক্রিয়ার জন্য যে চার রকমের বল রয়েছে তার মধ্যে শুধু মাধ্যাকর্ষণ বল ছাড়া আর কোনটিই এর জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন এই অদৃশ্য শক্তির ফলে একটি বিকর্ষণ বা ঋণাত্মক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে মহাবিশ্ব ক্রমাগত বেশি বেশি হারে প্রসারিত হচ্ছে। অদৃশ্য শক্তির উৎস খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা মনে পড়ে। এই তত্ত্বে তিনি মহাবিশ্বের আকার আকৃতি ও স্বরূপ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চিন্তা ছিল মাধ্যাকর্ষণে ক্রমাগত নিজের উপর নিজে সংকোচিত হওয়া এড়িয়ে মহাবিশ্ব কী ভাবে একই আয়তনে নিত্যকাল থাকতে পারবে তা নিয়ে। সে সময় বিশ্ব সব সময় একই আয়তনে থাকতে হবে এমন ধারণাই প্রচলিত ছিল। এ জন্য তিনি তত্ত্বের মধ্যে একটি মহাজাগতিক ধ্রুবক (কসমোলজিকাল কনষ্টান্ট) কল্পনা করে নিয়েছিলেন যা স্থান মাত্রকেই একটি বিকর্ষণ শক্তি দেবে, বস্তুর মাধ্যাকর্ষণকে ভারসাম্যে রাখার জন্য। পরে অবশ্য যখন প্রসারণশীল মহাবিশ্বের তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তখন আইনষ্টাইন এই মহাজাগতিক ধ্রুবকের আইডিয়াটি তাঁর তত্ত্ব থেকে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ জিনিসটি এখন অনেকে আবার ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন মনে করছেন, অদৃশ্য শক্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য। তাঁদের মতে এই মহাজাগতিক ধ্রুবকই অদৃশ্য শক্তির উৎস।

বিশ্ব সৃষ্টির সাত শত কোটি বছর পরের থেকে মহাবিশ্বের বস্তুপুঞ্জগুলো পরস্পর থেকে অনেক দূরে সরে গেলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ঘনত্ব কমে গিয়ে তা ঐ অদৃশ্য শক্তির ঘনত্ব ক্রমাগত কমালোনা কেন? এর কারণ প্রসারণটি বস্তুর সঙ্গে জড়িত নয় বরং জড়িত স্থানের সঙ্গে। প্রসারণের ফলে স্থান বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত স্থানে নূতন অদৃশ্য শক্তিরও জন্ম হয়েছে– ফলে এক্ষেত্রে ঘনত্ব কমেনি। আসলে আইনষ্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবকের মতই অদৃশ্য শক্তি হলো ভ্যাকুয়াম এনার্জি যা শূন্য স্থানেরই একটি গুণ। এর মত বিকর্ষণ শক্তি বা ঋণাত্মক চাপ আমরা মহাস্ফীতির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে দেখেছি। কিন্তু পার্থক্য হলো মহাস্ফীতি ঘটেছে প্রচন্ড উত্তপ্ত অবস্থায় বিশ্বের আদি মুহূর্তে। কিন্তু এই অদৃশ্য শক্তি অনেক কম ঘন অবস্থার জিনিস। গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জগুলো

পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবার সময় এ শক্তি যেন এদের মাঝখানের শূন্য স্থান থেকে নিংড়ে বেরিয়ে আসে ক্রমাগত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। এভাবেই এটি মহাপুঞ্জগুলোকে আরো ঠেলে দিয়ে প্রসারণের গতি বাড়িয়ে চলেছে।

মহাজাগতিক ধ্রুবক হিসেবে না দেখে অদৃশ্য শক্তির বিকল্প তত্ত্বও দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ একে এক রকম সারগর্ভ (কুইনটেসেন্স) ক্ষেত্র হিসেবে দেখা যায়। কোন স্থান জুড়ে যেভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র, মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র ইত্যাদি থাকতে পারে সে ভাবে স্থান জুড়ে এই ক্ষেত্রটিও থাকতে পারে অদৃশ্য শক্তির জনক হিসেবে। সেক্ষেত্রে এটি মহাজাগতিক ধ্রুবকের মত সুসম হবেনা বরং স্থানে ও কালে এর পরিবর্তন ঘটবে। অদৃশ্য শক্তি সম্পর্কে আরো নিখুঁত বিস্তারিত জ্ঞান আমাদেরকে বলে দেবে কোন তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য।

আজকাল পদার্থবিদ্যার একটি সম্ভাব্য চমকপ্রদ তত্ত্ব হিসেবে ষ্ট্রিং থিওরিকে অনেকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এর সম্পর্কে আর একটু বিস্তারিত আমরা পরের অধ্যায়ে দেখবো। এই ষ্ট্রিং থিওরিও অদৃশ্য শক্তির একটি বিকল্প সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছে। ষ্ট্রিং থিওরির একটি প্রধান বৈশিষ্ট হলো এটি স্থানকে আমাদের পরিচিত তিন মাত্রায় না দেখে এর মধ্যে আরো বেশ ক'টি অতিরিক্ত মাত্রা রয়েছে বলে ধরে নেয়। ষ্ট্রিং থিওরির ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্থানের এমনি একটি অতিরিক্ত মাত্রার প্রকাশ ঘটে অদৃশ্য শক্তি হিসেবে। ব্যাপারটি গাণিতিক ভাবে দেখানো সম্ভব হলেও কোন সত্যিকার পরীক্ষণে বা পর্যবেক্ষণে এখনো প্রমাণসাধ্য হয়নি।

মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জানার পরও একেবারে সাম্প্রতিককালে আমরা জানছি– যেই সাধারণ বস্তু আর শক্তিতে আমরা গড়া, যেগুলো নিয়ে আমাদের পরিচিত জগৎ, মহাবিশ্বে সেগুলোর প্রাধান্য নাই। বরং মহাবিশ্বে প্রাধান্য আছে অদৃশ্য শক্তির, এবং কিছুটা প্রাধান্য আছে অদৃশ্য বস্তুর। এগুলোকে আরো ভালভাবে জানাটি আমাদের সামনে নূতন চ্যালেঞ্জ।

বাকি প্রশ্ন ও কিছু চমকপ্রদ তত্ত্ব

যে সব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আসে

মহাবিশ্বের পুরো কাহিনী শুনার পরও সাধারণ বুদ্ধিতে আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে উঠে। বিগ্ ব্যাং এর আগে কী ছিল? কোন স্থানের মধ্যে বিগ্ ব্যাং ঘটলো? এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা সাফ্ জানিয়ে দিচ্ছেন বিগ্ ব্যাং নিজেই নিজের স্থানের সৃষ্টি করেছে, আগে থেকে থাকা কোন স্থানে এটি ঘটেনি। সময়ের শুরুও বিগ্ ব্যাং এর মুহূর্তেই, কাজেই এর আগে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের সাধারণ বুদ্ধি এরকম উত্তর মেনে নিতে চায়না। অন্তত বুঝার চেষ্টা করার মত ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে হবে বিজ্ঞানের কাছ থেকে। তবে সেই ব্যাখ্যা সব সময় একই ভাবে পাওয়া যাচ্ছেনা। নানা সম্ভাব্য তত্ত্ব দেয়া হচ্ছে এর জন্য, যার কোনটিই এখনো অকাট্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি পরীক্ষণ নির্ভর প্রমাণের অভাবে। কিন্তু তত্ত্বগুলো গাণিতিক যুক্তির উপর এবং বিভিন্ন ফলাফলের সুসঙ্গতির উপর নির্ভর করে আপাতত গ্রহণযোগ্য– যদিও এদের সবগুলো এক সঙ্গে সত্য হতে পারেনা।

একটি জিনিস অবশ্য স্পষ্ট– তা হলো মহাবিশ্বের আদি অবস্থা সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নগুলোকে কোয়ান্টাম বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। কোয়ান্টাম বাস্তবতা যে আমাদের সাধারণ বুদ্ধি এবং সাধারণ বাস্তবতার সঙ্গে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা আমরা দেখেছি ও আরো দেখবো।

মহাবিশ্বের অতীত বা তার জন্মের আগে সম্পর্কে যেমন প্রশ্নগুলো স্বাভাবিক তেমনি এর ভবিষ্যৎ নিয়ে কৌতুহল থাকাও স্বাভাবিক। এটি কি ক্রমাগত প্রসারিতই হতে থাকবে– ক্রমশ আরো বড়, আরো পাতলা এবং আরো ঠান্ডা হতে থাকবে? তার মানে এটি একটি অনিবার্য তাপ-মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছে শেষ অবধি যেখানে তেমন উৎসুক হবার মতো কিছু থাকবেনা। নাকি এর প্রসারণের পালা শেষ হয়ে আবার সংকোচনের পালা শুরু হবে যাতে আবার এটি একদিন বিন্দুতে পরিণত হতে পারে, আর এর প্রসারণের পালা আবার নূতন করে সৃষ্টি হতে পারে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে। সব কিছু নির্ভর করে মহাবিশ্বের আকৃতির উপর– এটি খোলা না বদ্ধ তার উপর। যদি খোলা হয়, তা হলে প্রসারণ চলতে থাকবে অনাদিকাল ধরে। আর যদি এটি বদ্ধ হয়, তা হলে কোন না কোন পর্যায়ে গিয়ে এর প্রসারণ থেকে গিয়ে সংকোচন শুরু হবে। কিন্তু আমরা মহাবিশ্বকে

যেভাবে পাচ্ছি তাতে এটি খোলাও না, বদ্ধও না। বরং সংকটাবস্থায় এটি উভয় অবস্থার খুব কাছাকাছি রয়েছে। এই সংকটের কোন দিকে যে এটি শেষ পর্যন্ত যাবে এখন তা জানার উপায় নাই। অর্থাৎ আমাদের মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, বর্তমান বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎদ্বাণীর ক্ষমতার বাইরে। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের আরো সূক্ষ্ম নূতন জ্ঞান হয়তো সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে।

বহু-বিশ্ব তত্ত্ব

কোয়ান্টাম বাস্তবতা সম্পর্কে একটি মৌলিক কথা হলো অনিশ্চয়তা। পারমাণবিক বা আরো ক্ষুদ্র কণিকার ক্ষেত্রে এর মতে বস্তুর ভৌত অবস্থাগুলো নিশ্চিত করে বলা যাবেনা। এটি কোথায় আছে, কী তার গতিবিধি ইত্যাদি একটি সম্ভাব্যতার হিসাবে অনিশ্চয়তার মধ্যেই শুধু বলা সম্ভব। যেমন অবস্থানের প্রসঙ্গে এলে এটি এখানে আছে এত সম্ভাব্যতা নিয়ে, আবার ওখানেও আছে এত সম্ভাব্যতা নিয়ে, এমনি ভাবেই বলতে হয়। এর চেয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। কাজেই ঐ বস্তুর অবস্থানের অবস্থাকে বিভিন্ন সম্ভাব্যতার অবস্থার উপরি-পাতন হিসাবে নিতে হয়। যে মুহূর্তে আমরা সত্যিই সেটি দেখতে পাই, সেই মুহূর্তে ঐ সম্ভাব্যতাগুলো ধসে পড়ে এবং একটি নিশ্চিত জ্ঞানের সৃষ্টি হয়।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্যতম সৃষ্টিকার শ্রোয়েডিঙ্গার এই তত্ত্বের অদ্ভূত ফলশ্রুতি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি মজার রূপকল্প দিয়েছিলেন। এতে তিনি কল্পনা করেছেন একটি বদ্ধ বাক্সে একটি বিড়ালের সঙ্গে কাঁচের সীলকরা শিশির মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস রাখা আছে। এমন যান্ত্রিক ব্যবস্থা এতে রয়েছে যাতে ওখানে রাখা তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে একটি কণিকার বাক্সে প্রবেশ করা না করার উপর নির্ভর করে বিষের শিশিটি ভাঙ্গবে কিনা। যদি কণিকাটি প্রবেশ করে তা হলে সে এমন একটি রিলে সুইচ চালু করে দেবে যাতে স্বয়ংক্রিয় হাতুড়ির আঘাতে শিশি ভাঙ্গবে, বিষাক্ত গ্যাস বেরুবে ও বিড়ালটি মারা

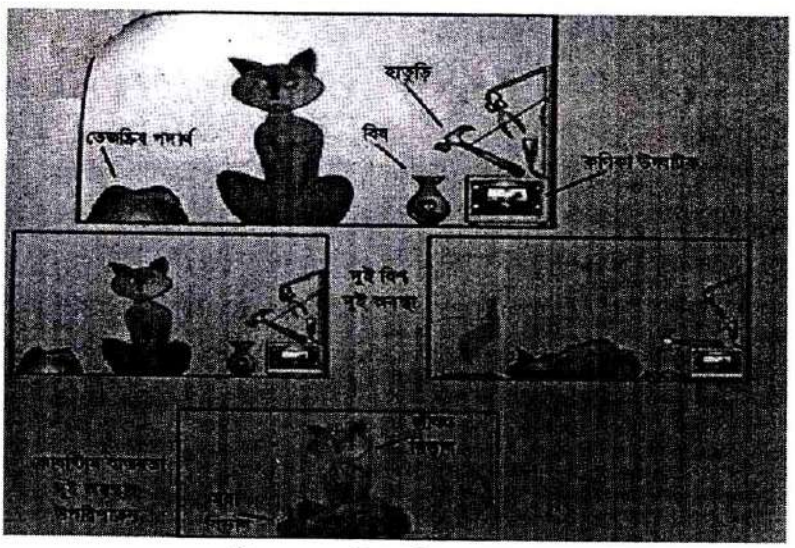

বহু-বিশ্ব তত্ত্ব (শ্রোডিঙ্গার-বিড়ালের উপমায়)

যাবে। যদি কণিকা না আসে তা হলে কিছুই হবে না, বিড়াল বেঁচে থাকবে। এখন বাক্সটির ভেতরটা আমরা দেখতে পাচ্ছিনা– কাজেই জানতে পারবনা বেড়াল বেঁচে আছে কি মরে গেছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে ঐ সময়ের মধ্যে কণিকা বের হবে কি হবেনা এটি নিশ্চিত নয়, এর শুধু সম্ভাবনাটিই হিসাব করা যায়। বেড়ালের বাঁচা মরার অবস্থা তাই কোয়ান্টাম বাস্তবতায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে ইতস্তত কণিকা নির্গত হবার নানা সম্ভাবনার উপরিপাতন। কাজেই আমাদেরকেও ধরে নিতে হবে বেড়ালটি বেঁচেও আছে আবার মরেও গেছে এমন একটি অদ্ভূত উপরিপাতিত অবস্থা। বেড়ালটি 'সত্যিই' মরা না জীবন্ত– কোয়ান্টাম বাস্তবতায় এই প্রশ্নের কোন অর্থ নাই। এটি অদ্ভূত হলেও সত্যি, কারণ সাধারণ বাস্তবতায় এমন পরিস্থিতি না থাকলেও কোয়ান্টাম বাস্তবতায় এটিই ঠিক। যেহেতু কোয়ান্টাম বাস্তবতার উপর আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তাই বৈজ্ঞানিক ভাবে একে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। পদার্থবিদ্যার অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন এই বাস্তবতার ভিত্তিতে সম্ভব হয়েছে। অনেক প্রযুক্তি এর উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত হয়েছে। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। যেই মুহূর্তে অবশ্য আমরা বাক্স খুলে বিড়ালকে দেখতে যাব সেই মুহূর্তে অবশ্য সেই উপরিপাতিত অবস্থার অবসান হবে– সেগুলো ধসে পড়ে নিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে– হয় বিড়াল বেঁচে আছে দেখা যাবে, নয় বিড়াল মরে গেছে দেখা যাবে। এই ধসে পড়াটি হলো কোয়ান্টাম বাস্তবতার সম্ভাবনা-তরঙ্গগুলো তাদের দশা-ভিন্নতার কারণে একে অন্যটিকে দমিয়ে দিয়ে এমন একটি মোট ফল দেয়া যা কিনা পর্যবেক্ষণের বাস্তবতা। 'শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল' নামে পরিচিত এই রূপকল্পটি প্রায়ই কোয়ান্টাম বাস্তবতার উপমা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

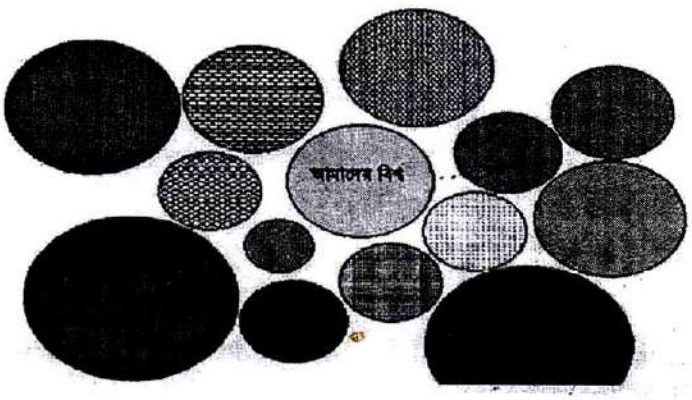

আমাদের বুদবুদ-বিশ্ব বহু বুদবুদ-বিশ্বের একটি।
অন্যগুলোর খোঁজ আমরা পাবনা।

কোয়ান্টাম বাস্তবতার অনুসরণে সম্প্রতি অনেক বিজ্ঞানী বহু-বিশ্বের তত্ত্ব উত্থাপন করেছেন। আমরা দেখেছি কীভাবে কোয়ান্টাম ফেনায় একটি বুদবুদ মহাস্ফীতির দ্বারা বর্ধিত হয়ে আমাদের মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে। বহুবিশ্ব তত্ত্বের মতে একটি বুদবুদ থেকে আমাদের মহাবিশ্ব যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমনি অন্যান্য বুদবুদ থেকে আরো অসংখ্য মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়তো হয়েই চলেছে। কোয়ান্টাম বাস্তবতার সম্ভাব্যতার জগতে এটিই স্বাভাবিক। এ সব বিশ্বের এক একটি এক এক ভাবে বিবর্তিত হয়েছে।

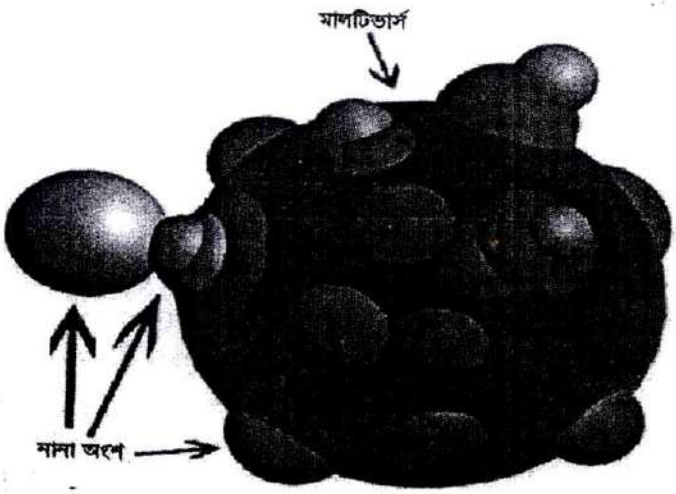

মালটিভার্সের নানা অংশের বিষম মহাস্ফীতিতে বহুতরো ইউনিভার্সের জন্ম

আমাদেরটির সঙ্গে এদের অধিকাংশেরই হয়তো কোন সাদৃশ্য নাই। এসব অবশ্য আমরা কোনদিন নিশ্চিত করতে পারবো না কারণ পদার্থবিদ্যার অমোঘ নিয়মে অন্য বিশ্বের সঙ্গে আমাদের আলোক কিংবা অনুরূপ কোন সিগ্‌ন্যালের মাধ্যমে যোগাযোগ সম্ভব নয়। এদেরকে কখনোই আমরা দেখতে পাবনা, কোন সাক্ষ্য-প্রমাণও এদের পাবনা। এই অর্থে এই তত্ত্বকে বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন হলেও এর সম্পর্কে গাণিতিক যুক্তিগুলো এত অকাট্য যে তত্ত্বটিকে ছুঁড়ে ফেলারও অবকাশ নাই। আমরা আগে ইউনিভার্স বা মহাবিশ্বকেই একমাত্র অস্তিত্ব ধরে নিলেও এখন সে রকম অস্তিত্বকে মালটিভার্স বা বহুবিশ্ব হিসাবে দেখতে হচ্ছে– অন্তত এই তত্ত্বে।

বহু-বিশ্ব তত্ত্বের একটি রূপে বলা হচ্ছে যে বহু বিশ্বের জন্ম হয়েছে মহাস্ফীতির সময়েই। মহাস্ফীতিটি আমরা যেভাবে মনে করেছি সেভাবে সুসম প্রতিসাম্য নিয়ে নাও ঘটতে পারে। অর্থাৎ ফুটবলের মতো একেবারে গোলগাল প্রতিসাম্যে স্ফীত না হয়ে এটি হয়তো এখান ওখানে নানা ফোলা অংশে বিষম ভাবে স্ফীত হয়েছে। এক একটি ফোলা অংশ আলাদা হারে স্ফীত হয়ে এক একটি মহাবিশ্বে পরিণত হয়েছে– যাদের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা ইতিহাস। এদের একটিই শুধু আমাদের নিজেদের মহাবিশ্ব। সবগুলোতেই মহাস্ফীতি ঘটেছে আলোর গতির চেয়ে বেশি গতিতে। আগেই দেখেছি এটি সম্ভব– কারণ বস্তু বা শক্তি আলোর গতি অতিক্রম না করতে পারলেও স্থানের এটি করতে কোন বাধা নাই। কিন্তু ঐ ভাবে স্ফীত হওয়া অন্যান্য বিশ্ব থেকে আলো বা আলোর মত সিগন্যাল তো তাদের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের কাছে কোনদিন পৌঁছতে পারবেনা, তাই আমরা এদের সম্বন্ধে জানতেও পারবোনা। বাক্সের ভেতর জীবন্ত-মরা বিড়ালের মত এগুলো আমাদের জন্য সম্ভাব্যতার বিশ্ব হয়ে থাকবে। শুধু তাই নয়, পরস্পরের মধ্যে কোন রকম সিগ্‌ন্যাল চালনা সম্ভব নয় বলে এসব বিশ্ব একে অপরকে কোনভাবে প্রভাবিতও করতে পারবেনা। এরকম বিষম মহাস্ফীতিকে বলা যায় বিশৃঙ্খল মহাস্ফীতি (কেয়োটিক ইনফ্ল্যাশন)। কোন কোন বিজ্ঞানী আবার এক পা এগিয়ে

চিরন্তন মহাস্ফীতির (এটারনাল ইনফ্ল্যাশন) কথা বলছেন। এতে মূল মহাস্ফীতিটি শেষ হয়নি, কখনো হবেওনা। বিষম ঐ মহাস্ফীতি থেকে নূতন নূতন ফোলা জায়গা বেরুচ্ছে যা ক্রমাগত একটি মহাবিশ্বে পরিণত হচ্ছে, এবং আরো নূতন নূতন হতেই থাকবে।

মানবমুখি মনে হবার এটিই হয়তো কারণ

আমরা অবশ্য মহাবিশ্বের ইতিহাস আবিষ্কার করতে পারছি আমাদের নিজেদের মহাবিশ্বটার। এটি আবিষ্কার করে আমরা চমকে উঠছি যে এখানে অনেক কিছু ঘটেছে যা একেবারে সূক্ষ্মভাবে ঠিক যেন খাপের খাপ আমরা আসতে পারার উপযুক্ত করেই ঘটেছে। যেমন স্মরণ করুন মহাস্ফীতিটি যদি ঠিক ঐ সময়, ঐটুকু স্থায়ী হয়ে, ঐটুকু জোর নিয়ে না ঘটতো, একটুকুও এদিক ওদিক হতো, তা হলে গ্যালাক্সি সৃষ্টি হতোনা আমরা আসতামনা। ঐটুকু মসৃণতার তারতম্য যদি আদি বিশ্বে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে না সৃষ্টি হতো তা হলেও আমরা আসতামনা। নিউট্রন-প্রোটনের অনুপাত যদি আদিতে ঠিক ঐ পর্যায়ে এসে স্থিতি না পেতো তা হলেও আমরা আসতে পারতামনা। মহাবিশ্বের প্রসারণ যদি একে ঠিক সংকট অবস্থায় না রাখতো তা হলে হয় বদ্ধ হয়ে তারা সৃষ্টি অনেক আগেই এতে আবার সংকোচন শুরু হতো, নইলে খোলা হয়ে এর প্রসারণ এত দ্রুত হতো যে বস্তুপুঞ্জ জমে তারা সৃষ্টিই হতো না। ঐ সূক্ষ্ম সংকটে থাকাটি যেন আমাদের আগমণের জন্যই। চিন্তা করুন, মহাবিশ্বে অদৃশ্য শক্তি, অদৃশ্য বস্তু, সাধারণ বস্তু, সাধারণ শক্তি সব মিলে এদের পরিমাণ যদি মহাবিশ্বকে একেবারে হুবহু সংকট আকৃতিতে রাখার উপযুক্ত না হতো তাহলে কী হতো। এরপরেও অবশ্য আরো অনেক কিছু ঠিক যেন আমাদের আগমণের উপযুক্ত হয়ে ঘটেছে– পৃথিবীর সৃষ্টি ও তাতে প্রাণের সৃষ্টি হতে পারা, প্রাণের বিবর্তন ঠিক এই পথে এগুনো– যদিও সেটি একেবারেই অনিশ্চিত একটি প্রক্রিয়া– ইত্যাদি অনেক কিছু। এভাবে বিজ্ঞানীরা আমাদের মহাবিশ্বের সবকিছুর মধ্যে একটি 'মানব-মুখিতা' দেখে অবাক হচ্ছিলেন। এখন বহুবিশ্ব তত্ত্ব এই রহস্যের এক রকম সমাধান করতে পেরেছে।

বহু-বিশ্ব তত্ত্ব যদি সঠিক হয় তা হলে আমাদের বিশ্বের মানব-মুখিতায় অবাক হবার কিছু নাই। অসংখ্য বিশ্বের এক একটি এক এক ভাবে এগিয়েছে। কোনটাতে বস্তু সৃষ্টি হয়েছে, কোনটাতে হয়নি। কোনটাতে গ্যালাক্সি সৃষ্টি হয়েছে, কোনটাতে হয়নি। কোনটাতে প্রাণ এসেছে, কোনটাতে আসেনি। এই সব কিছু এক একটি এক এক রকম হয়েছে। আমাদের মহাবিশ্বে এসবের ইতিহাস একটি বিশেষ খাতে এগিয়েছে যা দৈবক্রমে আমাদের আসার উপযুক্ত হয়েছে। তাই আমরা এসেছি এবং এসে এর মানব-মুখিতা দেখে বিস্মিত হতে পারছি। অনেকগুলো বিশ্বে যে ঠিক ঠাক ওভাবে মানব-মুখি ভাবে সব কিছু হয়নি সেকথা মনে রাখছি না। আরো কোনটাতে হয়েও থাকলে তা আমাদের জানার উপায় নাই।

প্রশ্ন উঠতে পারে বহু বিশ্বের মধ্যে যে কোন একটি বিশ্ব প্রসারিত হয়ে অন্য বিশ্বের স্থান-কালের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ছে না তো? তত্ত্বে সে রকম কোন সুযোগ নাই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্থান-কালকে নিয়ে প্রসারিত হচ্ছে– তাদের অবস্থিতি ভিন্ন ভূবনে– অন্যটার ভূবনে যাওয়ার কোন সুযোগ নাই। অন্যের স্থান-কাল আত্মসাতেরও সুযোগ নাই। এই তত্ত্ব অনুযায়ী অন্যগুলো আমরা না দেখতে পেলেও সেগুলো নাই এমন কথা বলা

বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রাহ্য নয়, কারণ বৈজ্ঞানিক-গাণিতিক যুক্তির নিরিখে সেগুলো আছে। তাই অসংখ্য মহাবিশ্বনিয়ে আমাদেরকে হয়তো একটি মহামহাবিশ্বের (মালটিভার্স) চিন্তা করতে হবে।

বহু-ইতিহাসের যোগফল তত্ত্ব

বহু-বিশ্ব তত্ত্বের মতোই আর একটি অবাক করা তত্ত্ব হলো বহু-ইতিহাসের যোগফল তত্ত্ব। এতে বহু বিশ্বের কথা বলা হচ্ছেনা। বলা হচ্ছে একই বিশ্বের বিবর্তনের অসংখ্য রকমের ইতিহাস রয়েছে– এবং তার প্রত্যেকটিই 'ঘটেছে' কোয়ান্টাম বাস্তবতার নিরিখে, যেরকম শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল বেঁচেও ছিল এবং একই সঙ্গে মরেও ছিল। তেমনি মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের যোগফল তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের মহাবিশ্বের বহু রকমের বিভিন্ন ইতিহাস আছে। এক ইতিহাসে হয়তো এটি বদ্ধ ছিল, বেশিদিন প্রসারিত হয়নি, তারার জন্ম পর্যন্ত যায়নি। আরেকটিতে হয়তো প্রসারিত ঠিকই হয়েছে কিন্তু ঘনত্বের সঠিক তারতম্যের অভাবে গ্যালাক্সি সৃষ্টিই হয়নি। এভাবে অসংখ্য রকমের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা

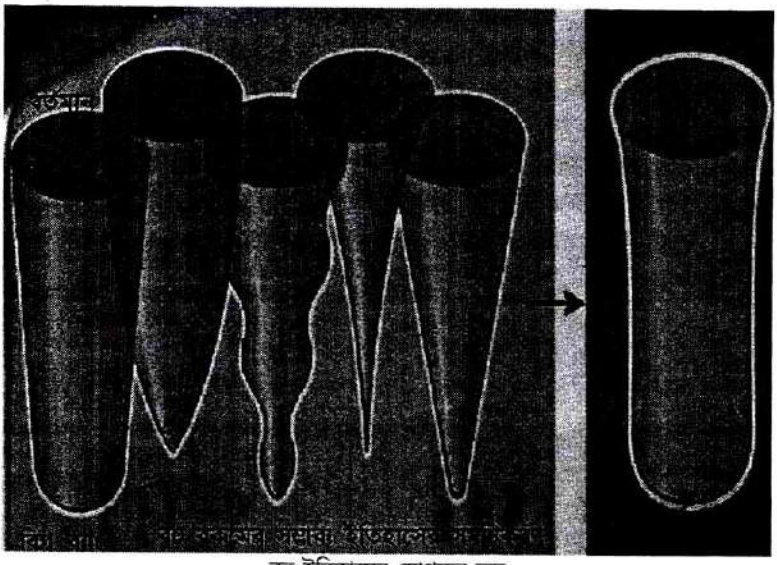

বহু ইতিহাসের যোগফল তত্ত্ব

পরম্পরায়ে ভিন্ন ইতিহাস এর রয়েছে। কোন ইতিহাসে প্রাণের সৃষ্টি হতে পেরেছে, কোনটাতে তা হতে পারেনি। কোয়ান্টাম বাস্তবতায় যেটি সত্য তা হলো এদের একটি উপরিপাতিত বর্ণনা– বহু ইতিহাসের সমষ্টি। সমষ্টিটি কোয়ান্টাম তত্ত্বের গাণিতিক অঙ্ক কষার মাধ্যমেই পাওয়া যাওয়ার কথা। পর্যবেক্ষণ করার প্রক্রিয়ায় সব ইতিহাসের গাণিতিক সমষ্টি হিসাবে আমাদের বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে। পর্যবেক্ষণে যখন বিড়ালকে আমরা হয় জীবন্ত নইলে মরা দেখছি তাও বিড়ালের জীবন-মৃত্যুর নানা রকম সম্ভাবনা সম্বলিত নানা ইতিহাসের গাণিতিক সমষ্টিটি দেখছি। তবে তার মানে এই নয় যে অপর্যবেক্ষিত যে অনেকগুলো ইতিহাসের সমষ্টি এটি, তারাও সত্যি নয়। বিজ্ঞানের চোখে তাদের প্রত্যেকটিও সত্য, পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ইতিহাসে তাদের একটি প্রাসঙ্গিকতা আছে।

বিগ্ ব্যাং এর আগে কী ?

বিজ্ঞানীরা যতই ছোট্ট করে জবাব দেন যে বিগ্ ব্যাং এর আগে কিছুই ছিল না- তাঁরা কিন্তু প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাঁরা বিভিন্ন তত্ত্বে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন যে কোন অর্থে বিগ ব্যাং-এর আগে স্থান বা কাল কোনটির অস্তিত্ব ছিল না। বিগ্ ব্যাং-ই স্থানের শুরু এবং কালেরও শুরু। আমরা ষ্টিফেন হকিংস এর দেয়া এমনি একটি তত্ত্ব দেখতে পারি। আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বে স্থানের তিন মাত্রা ও কালের এক মাত্রা একত্র করে স্থান-কালের চারমাত্রিক বিশ্বের ধারণা দিয়েছিলেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে যার যে কোনটি অন্য যে কোনটিতে পরিণত হতে পারে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির ঠিক মুহূর্তটিতে $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে এটি ছিল সম্পূর্ণ কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার অধীন। ঐ প্ল্যাংকের সময়ের মধ্যে স্থান-কালের চার মাত্রার মধ্যে কালের মাত্রাটিও স্থানের মাত্রার মত কাজ করছিল। সৃষ্টির ঐ মুহূর্তে মহাবিশ্ব এত প্রচন্ড ভাবে সংকুচিত ছিল যে সেখানে স্থান-কালের বক্রতা অত্যন্ত বেশি ছিল এবং তা প্রচন্ডভাবে ইতস্তত পরিবর্তিত হচ্ছিল। এমন অবস্থায় অনিশ্চয়তা তত্ত্ব স্থান ও কালের ন্যূনতম পার্থক্যটিও বিলুপ্ত করে দেয়। কাজেই বিগ্ ব্যাং কালীন মহাবিশ্বকে আমরা চার মাত্রিক স্থানে গড়া মনে করতে পারি। তিন মাত্রিক গোলকের (যেমন গ্লোবের) তলটিকে যেমন আমরা একটি সীমানাবিহীন মসৃণ দ্বিমাত্রিক স্থান হিসাবে দেখি, তেমনি চারমাত্রিক বিশ্বের তলটিকেও আমরা একটি সীমানাবিহীন ত্রিমাত্রিক তল হিসাবে পেতে পারি।

আপাতত আমরা গ্লোবের দ্বিমাত্রিক তলের দিকেই তাকাই। অথবা বরং একইভাবে পৃথিবীর তলের দিকেই তাকাই। যদি এই তলের উপর দিয়ে আমরা সোজা উত্তর দিকে চলতে থাকি, তবে এক সময় উত্তর মেরুতে পৌঁছে যাব। চিহ্নিত করা না থাকলে আমরা তা সাধারণ অবস্থায় বুঝতেও পারবনা, সর্ব উত্তরের বিন্দুটি যে অতিক্রম করেছি তা না বুঝেই আরো উত্তরে যাচ্ছি ভেবে যেভাবে হাঁটছিলাম হাঁটতেই থাকব। কাজেই উত্তর মেরুরও আরো উত্তরে কী– এই প্রশ্নের কোন মানে হয়না। উত্তর মেরুতে ভূগোলকের কোন সীমানা নাই বলেই, তলটি সেখানে মসৃণভাবে বেঁকে গেছে বলেই এমন। তেমনি হকিংসের তত্ত্বে ত্রিমাত্রিক মহাবিশ্ব তলেরও কোথাও কোন সীমানা নাই, কোন সূচনা-বিন্দু নাই, তাই কোন সিঙ্গুলারিটিও নাই। আমরা যদি বিগ্ ব্যাং-কে অতিক্রম করে কালের হিসেবে আরো অতীতে যাওয়ার চেষ্টা করি উত্তর মেরুর উত্তরে যাওয়ার মতই চেষ্টা হবে ওটি। সব মাত্রা স্থানের বলেই ব্যাপারটি আমাদের স্থানে হেঁটে যাওয়ার মত হবে।

সেই প্ল্যাংকের সময়ের পর সময়ে এগিয়ে গেলে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কোয়ান্টাম বাস্তবতাগুলো তখন পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নিজেদেরকে বিলীন করে দিতে থাকে– যেভাবে একটি তরঙ্গের শীর্ষ অন্য একটি তরঙ্গের তলার সঙ্গে বিক্রিয়া করে উভয় তরঙ্গ বিলুপ্ত হয় অনেকটা সেভাবে। কোয়ান্টাম বাস্তবতা বিলীন হলে দেখা দেয় সাধারণ বাস্তবতা যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় রয়েছে। সেখানে কালের অস্তিত্ব আছে, সেখানে মহাবিশ্ব স্থান-কালের চার মাত্রায় গড়া, কাল বাদ দিয়ে শুধু স্থানের চার মাত্রায় নয়। তাই সেখানে একটি ঘটনার আগে কী– এ রকম প্রশ্নের অর্থ থাকে।

বিগ্ ব্যাং-এর অতীতে যাওয়ার চেষ্টা যেমন অবান্তর তেমনি বিগ্ ব্যাং -এর বাইরে কোন স্থানের খোঁজ করাও অবান্তর। বিগ্ ব্যাং আগে থেকে মজুদ কোন স্থানের মধ্যে ঘটেনি– সে নিজেই স্থান সৃষ্টি করে নিয়েছে।

থিওরি অব এভ্‌রিথিং

আমরা আগেই দেখেছি মহাবিশ্বের শুরুর মুহূর্তের পরিস্থিতিতে চার রকমের বলই একীভূত অবস্থায় ছিল। কোয়ান্টাম সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ বিগ্ ব্যাং এর $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ডের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ এই প্রতিসাম্য ভেঙ্গে আলাদা হয়ে গেছে। এর পর $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ডের সময় নিউক্লিয়ার সবল বলও আলাদা হয়েছে। কিন্তু GUT তত্ত্ব ঐ সবল বল সহ তিন বলের একীভূত তত্ত্ব দিয়েছে এবং এখন তা পরীক্ষিতও হতে যাচ্ছে। কিন্তু এ তিন বলের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণকে মিলিয়ে সর্বাত্মক একীভূত তত্ত্ব এখনো সর্বস্বীকৃতভাবে কেউ দিতে পারেনি। যদি পারে তবে তা হবে থিওরি অব এভ্‌রিথিং– সবকিছুর তত্ত্ব, চারটি বলেরই একীভূত তত্ত্ব। এটি অপেক্ষাকৃত কঠিন, কারণ অন্য তিনটি বলের তুলনায় মাধ্যাকর্ষণ বলের তীব্রতা অতি নগণ্য, একে সেগুলোর সঙ্গে একই প্রতিসাম্যে ভাবা যায়না।

এই তত্ত্ব এলে সত্যিকার অর্থে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ভাল ফয়সালা হবে। চার বলের সর্বব্যাপ্ত প্রতিসাম্যের মধ্যে বিশ্ব-সৃষ্টির মুহূর্তটিকে প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিদ্যার আওতায় আনা যাবে শেষ পর্যন্ত, যেমন করে GUT তত্ত্ব $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ড বয়সী বিশ্বকে, মহাস্ফীতিকে, এরকম আওতায় নিয়ে এসেছে অনেকটাই। থিওরি অব এভ্‌রিথিং এর প্রচেষ্টায় কিছুটা সাফল্য সাম্প্রতিক কালে এসেছে। এতে এগিয়ে রয়েছে স্ট্রিং থিওরি। অনেক বিজ্ঞানী অবশ্য এর নানা দুর্বলতার কারণে স্ট্রিং থিওরিকে এখনো বৈধ তত্ত্ব বলে মানতে রাজি নন। তা সত্ত্বেও এটি এত বিভিন্ন রকম কিছুর সমাধানে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে এই চমকপ্রদ তত্ত্বটির উল্লেখ করেই আমরা মহাবিশ্ব সৃষ্টির মুহূর্তটি সম্পর্কে চমকপ্রদ নানা তত্ত্বের উদাহরণগুলো শেষ করবো।

সাধারণ কণিকাবিদ্যার গাণিতিক ছবিতে কণিকাকে বিন্দু হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু স্ট্রিং থিওরিতে একে দেখা হয় অতি সরু সূতার আকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লুপ বা রিং হিসাবে– এই সূতা থেকেই স্ট্রিং থিওরি অথবা সুপার স্ট্রিং থিওরি নামটি এসেছে। এই তত্ত্বের মতে সকল বস্তু ও সকল শক্তির মৌলিকতম উপাদান হলো এই ক্ষুদ্র সূতার লুপ। এই সূতা অনেক গুণ সম্পন্ন– এর এমন উচ্চ স্তরের প্রতিসাম্য রয়েছে যে সকল বস্তু ও শক্তি কণিকার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এই একই সূতা। বিভিন্নতাটি আসে শুধু এর কম্পনহারে– এক এক কম্পন হার এক এক কণিকার প্রতিনিধিত্ব করে। সাধারণ নিম্ন তাপে এই সূতা সংকোচিত হয়ে থাকে বলেই তা বিন্দুর মত আচরণ করে। এই কারণেই বস্তু বা শক্তি কণিকাগুলো আজকের সচরাচর সাধারণ উত্তাপে বিন্দু-কণিকার মতই আচরণ করে। কিন্তু বিগ্ ব্যাং এর সময়ের অত্যন্ত উচ্চ উত্তাপে এর উপর টানগুলো বেশি ছিল বলে এটি বিন্দু নয় সূতার লুপের মত ছিল, উচ্চতর প্রতিসাম্যের নানা 'সুপার' গুণ নিয়ে- যেমনটি সুপার স্ট্রিং থিওরিতে বলা হচ্ছে। এই অবস্থাতে মাধ্যাকর্ষণও সেই বৃহত্তর প্রতিসাম্যে শামিল হতে পারে– চারটি বলেরই একীভূত তত্ত্ব সৃষ্টি করে। এভাবেই থিওরি অব এভ্‌রিথিং হবার দাবী করছে স্ট্রিং থিওরি।

এই তত্ত্বের একটি ফলশ্রুতি হলো এতে বিশ্বের স্থানিক মাত্রা তিনটি নয়– অন্তত নয়টি, কোন কোন ক্ষেত্রে আরো বেশি। কিন্তু মহাবিশ্বের সৃষ্টির পর্যায়ে বিগ্ ব্যাং এর পর এর আকার যখন মাত্র $১০^{-৩৩}$ সেন্টিমিটারের মত তখনই তিনটি ছাড়া অন্য মাত্রাগুলো গুটিয়ে লুকিয়ে গিয়েছিল– আমরা তাই এরপর থেকে তিনটি মাত্রাই দেখছি। অবশ্য গুটানোর প্রক্রিয়াটি এখনো স্পষ্ট নয়। ঐ অতিরিক্ত মাত্রাগুলো স্ট্রিং থিওরিকে বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের সম্ভাবনা থেকে দূরে রেখেছে, এর গাণিতিক যুক্তিগ্রাহ্যতা সত্ত্বেও। তাছাড়া স্ট্রিং থিওরিকে এর অনেক প্রবক্তা বিভিন্ন বিকল্প রূপে উপস্থাপন করেছেন এবং

তার প্রত্যেকটি যথেষ্ট ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একই ফল দিচ্ছে এবং একই ভাবে সফল হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে এরকম নানা যাত্রায় একই ফল ভাল কথা নয়। এও ষ্ট্রিং থিওরির একটি দুর্বলতা।

ষ্ট্রিং থিওরির একটি বিকল্পে সূতা আর সূতার আকারেই থাকেনি। সূতার পূর্বসূরি হয়ে এসেছে মেমব্রেন বা ঝিল্লি অর্থাৎ পাতলা পর্দা। একে সংক্ষেপে ব্রেনও বলা হয়। এক্ষেত্রে ব্রেনের কম্পনহারই সব কিছু নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে। এই ব্রেনের উপর ভিত্তি করে ষ্ট্রিং থিওরি বিগ ব্যাং এর একটি নূতন ব্যাখ্যাও দিয়েছে যা বেশ চমকপ্রদ। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিগ্ ব্যাং এরও আগে ছিল সর্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত এক অস্থায়ী ব্রেন। বিগ্ ব্যাং-এ মহাবিশ্ব জন্মের মুহূর্তে এই ব্রেন ভেঙ্গে গিয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র সূতার লুপের সৃষ্টি হয়েছে– সাধারণ ষ্ট্রিং থিওরিতে যেমনটি রয়েছে। তারপর থেকেই আমরা সূতার লুপে গড়া আমাদের পরিচিত বিশ্বকে পাচ্ছি। আর ওভাবে ব্রেন ভেঙ্গে ষ্ট্রিং- লুপ হবার মুহূর্তেই কালেরও জন্ম। ষ্ট্রিং থিওরিতে কালের ধারণা আসে এভাবেই। বিগ্ ব্যাং এভাবে হবার সুবিধা হলো এতে সিঙ্গুলারিটি সমস্যা আর থাকেনা– যে সমস্যা বিজ্ঞানীদেরকে এত যাতনা দিচ্ছিল। তাছাড়া বিগ্ ব্যাং এর আগের একেবারে সুসম ব্রেন থেকে মহাবিশ্ব জন্ম নিয়েছে বলে তা পরবর্তী সুসমতা ব্যাখ্যা করতেও সুবিধা হয়ে গেছে।

ষ্ট্রিং থিওরির বিগ্ ব্যাং বর্ণনাকে আরো একটু বিস্তৃত করা যাক। এতে দেখা যায় বিগ্ ব্যাং এরও আগে ছিল ১১টি মাত্রা যার ৬টি নিজেদের মধ্যে গুটানো ছিল– প্রকাশিত ছিল মাত্র ৫টি- একটি পাঁচ-মাত্রিক স্থানে (স্পেসে)। সেই পাঁচ মাত্রিক স্থানে ছিল দুটি চার মাত্রিক ব্রেন– প্রত্যেকটি সর্বত্র ব্যাপ্ত চেপ্টা পর্দার মত। তবে মনে রাখতে হবে আজকের বাস্তবতায় আমাদের পরিচিত চেপ্টা পর্দা তিন মাত্রিক স্থানে রয়েছে বলে নিজে দুই মাত্রিক। সেভাবেই এক্ষেত্রে পাঁচ মাত্রার স্থানে আছে বলে ব্রেনের এই পর্দা চার মাত্রিক। ব্রেন দুটির একটিই শুধু ছিল প্রকাশিত, অন্যটি লুক্কায়িত– অবশ্য তা সত্ত্বেও দুটি পরস্পরের সমান্তরাল এবং একে অপরের আয়নার প্রতিচ্ছবির মত (মিরর ইমেজ)। আমাদের কাছে যেটি প্রকাশিত সেটিই পরে আমাদের মহাবিশ্ব হয়েছে। লুক্কায়িত ব্রেনটিতে ইতস্তত ফ্লাকচুয়েশন বা তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তা সামনে এগিয়ে প্রকাশিত ব্রেনটির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এই সংঘর্ষের শক্তিটিই বিগ্ ব্যাং, যা এর পর আমাদের মহাবিশ্বের শক্তি ও বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আর এমনটি হয়েছে প্রকাশিত ব্রেনটি ভেঙ্গে অসংখ্য ষ্ট্রিং-লুপে পরিণত হবার মাধ্যমে। এটিই ঘটেছে বিগ্ ব্যাং এর মুহূর্তে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই একই প্রক্রিয়ায় বহু-মাত্রিক স্থানের অন্তর্নিহিত গুণ হিসাবে ঐ স্থানের ভেতর থেকে আমাদের বিশ্বের মত আরো বহু বিশ্ব সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে এবং তাই এটি বহুবিশ্ব তত্ত্বের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ।

ষ্ট্রিং থিওরি বিগ্ ব্যাং-এরও আগে গিয়ে আদি স্থান ও কালের একটি গঠন দেবার চেষ্টা করেছে, একদিকে মহাবিশ্বের বৃহতের জগত ও অন্যদিকে ক্ষুদ্র কণিকার জগতের (ষ্ট্রিং এর) অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যা বহু দিন ধরে পদার্থবিদদের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এর গাণিতিক যৌক্তিক সাফল্য যতই থাকুক একে বাস্তব পরীক্ষণের কোন সুযোগ এর মধ্যে নাই– তাই এটি এখনো নেহাতই একটি আপাত তত্ত্ব হয়েই রয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী এই ষ্ট্রিং থিওরির মধ্যে অনেক সম্ভাবনা দেখেন, তবে অনেকে এর ভিত্তি দুর্বল মনে করেন।

জানা অজানা মহাবিশ্ব

আমাদের পুরো আলোচনায় আমরা মহাবিশ্বের ইতিহাসকে দুই পর্যায়ে বিবেচনা করেছি। প্রথম পর্যায়ে বিগ্ ব্যাং থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পুরো ইতিহাসকেই ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যেভাবে এটি এখন বৈজ্ঞানিকভাবে মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত– বিশেষ করে সাম্প্রতিক অনেক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। এখানে আমরা জ্ঞানের বেশ শক্ত ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছি। এতে আমরা জানি মহাবিশ্বের একটি শুরুর মুহূর্তে আছে, এর বয়স প্রায় চৌদ্দ শত কোটি বছর, এর ক্রমাগত প্রসারণ হচ্ছে যার ফলে আজ এর যে সুদূরতম গ্যালাক্সি বা তারার খোঁজ পাচ্ছি তার দূরত্ব এক হাজার কোটি আলোক বর্ষেরও বেশি। তার বাইরেও বিস্তৃত আমাদের মহাবিশ্ব। মহাবিশ্বের আকৃতিটি বদ্ধ বা খোলা কোনটি না হয়ে মাঝামাঝি সংকটে আছে। তাই এতে অদৃশ্য বস্তুর উপস্থিতি অপরিহার্য এবং তা পরোক্ষ পরীক্ষায় প্রমাণিত। প্রসারণের হার বাড়ছে, তাই অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বও পরোক্ষ পরীক্ষায় প্রমাণিত। বিগ ব্যাং-এর এক মিলিসেকেন্ড পর থেকে এর ইতিহাসের বহু খুঁটিনাটি আমাদের করায়ত্ত– কেমন করে সৃষ্টি হয়েছিল এর বস্তু ও শক্তি, কেমন করে সৃষ্টি হয়েছে গ্যালাক্সি, তারা, গ্রহ, যেমন আমাদের পৃথিবী। এসব জানা মোটেও সহজ ছিল না, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সফল হয়েছে।

কিন্তু যেখানে আমরা জ্ঞানের তত শক্ত ভূমির উপর দাঁড়িয়ে নাই তা হলো বিগ্ ব্যাং এর পর এক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে ঘটা বিষয়গুলো। এগুলোই ছিল আমাদের পরের দিকের আলোচনার বিষয়। সেখানে মহাস্ফীতির ঘটনাটি মোটামুটি এখন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিগ্ ব্যাং-এর অত্যন্ত ঘন ও উত্তপ্ত অবস্থা, এর সিঙ্গুলারিটি সমস্যা, এর আগে পরের ঘটনা– এ সবে আমরা এখনো শুধু বেশ কিছু গাণিতিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করছি, পরীক্ষিত তত্ত্বের উপর নয়। তাছাড়া অদৃশ্য বস্তু ও অদৃশ্য শক্তির প্রকৃত স্বরূপও এখনো সরাসরি পরীক্ষিত নয়। এ সবের পূর্ণ নিষ্পত্তি এখনো রয়ে গেছে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের হাতে। এর মধ্যে আছে মহাবিশ্বের ভবিষ্যতের প্রশ্নটিও। এ সম্পর্কে তত্ত্বগুলোর মধ্যে যেমন অনাদি কালের মধ্যে বার বার পালাক্রমে বিশ্বের প্রসারণ-সংকোচনের তত্ত্ব রয়েছে, তেমনি রয়েছে চির প্রসারণ তত্ত্ব। অন্য প্রসঙ্গে বহু-বিশ্বের তত্ত্বটিও আমাদেরকে প্রলুব্ধ করে। অনেক প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য একটি সফল 'থিওরি অব্ এভ্রিথিং' প্রয়োজন। এখনো তা আমাদের হাতে নাই। কিন্তু এসব নিয়ে মহা উৎসাহে বিজ্ঞানী মহলে যে চেষ্টা চলছে তা বিজ্ঞানকে বিশেষ করে পদার্থবিদ্যাকে দারুণভাবে সমৃদ্ধ করে চলেছে। মহাবিশ্বের উপলব্ধিকে উন্নত করার চেষ্টায় বিজ্ঞান অবিরতভাবে উন্নত হচ্ছে, আমরা উন্নত হচ্ছি।

এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের অতি নগণ্য স্থানে আমরা মানুষ এই বিশাল কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছি। আমরা ক্ষুদ্র হতে পারি, কিন্তু আমাদের চিন্তায় ও বিজ্ঞানে আমরা ধারণ করতে পারছি ঐ পুরো মহাবিশ্বকে, তার মহা বিশালতার মধ্যে খুঁজে নিতে পারছি আমাদের অস্তিত্বের শিকড়। এটিই আমাদের সাফল্য।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১: মহাবিশ্ব প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানের প্রসারণ ঘটছে। একইভাবে সময়েরও কি কোন প্রসারণ ঘটছে?

উত্তর : মহাবিশ্বের প্রসারণ স্থানেরই প্রসারণ। কালের ক্রমেই তা প্রসারিত হয়েছে, চৌদ্দ শত কোটি বছর ধরে।

প্রশ্ন ২: আমাদের কাছের জিনিসগুলো থেকে আমরা মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে দূরে সরে যাচ্ছিনা। এই দূরে সরে যাবার বিষয়টি প্রযোজ্য এমন সব চেয়ে ছোট দূরত্ব কী?

উত্তর : মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে আমরা সূর্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি না, কারণ সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ প্রসারণের শক্তির চেয়ে বেশি। তেমনি গ্যালাক্সির তারাগুলোও পরস্পর থেকে সরে যাচ্ছেনা। এমনকি গ্যালাক্সিগুলো একে অপর থেকে সরছেনা। মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটেছে গ্যালাক্সিপুঞ্জগুলোর মধ্যে আরো স্পষ্টভাবে গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জগুলোর মধ্যে। তবে এ বিশাল মহাবিশ্বে অসংখ্য গ্যালাক্সি মহাপুঞ্জ আছে যারা পরস্পর থেকে ক্রমাগত সরে সরে যাচ্ছে। প্রসারণের পুরো ব্যাপারটি ঘটছে বড় স্কেলে, অপেক্ষাকৃত ছোট স্কেলে নয়।

প্রশ্ন ৩: আপনি বলেছেন সেই বিগ্ ব্যাংএর দশ লক্ষ বছর পর মহাবিশ্ব স্বচ্ছ হয়ে শক্তি উন্মুক্ত হয়েছে। তারপর থেকে বস্তুর প্রাধান্য বেড়েছে, শক্তির মাত্রা কমে গেছে– যা এখন ক্ষীণ CMB হয়ে পড়েছে। কিন্তু শক্তির নিত্যতার কারণে তা এভাবে কমে যাওয়ার কথা তো নয়।

উত্তর : না কমে যায়ওনি। সেই বিগ্ ব্যাং-এর দশ লক্ষ বছর পর থেকে শক্তি কমে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে এর ঘনত্ব কমেছে মাত্র। ঘনত্ব কমার ফলেই এটি ঠান্ডা হয়েছে, এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ বড় হতে হতে মাইক্রোওয়েভে পরিণত হয়েছে। শক্তির নিত্যতার সূত্র এখানে লঙ্ঘিত হয়নি। প্রসারণের ফলে শক্তি ঘনত্ব কমে এটি পাতলা হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে বস্তু পুঞ্জীভবনের প্রক্রিয়ায় কোথাও কোথাও বস্তু ঘন হয়ে জমাট বেঁধে গ্যালাক্সি প্রভৃতি গঠন করতে পেরেছে। তাই বস্তু প্রাধান্য লাভ করেছে।

প্রশ্ন ৪: মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিপুঞ্জগুলো প্রসারণের ফলে সরে গিয়ে পরিবর্তন হলেও এর তারাগুলো কিন্তু পরিবর্তন হবার কথা নয়। তা হলে তারাগুলো কেন বহু বছর

পর পরিবর্তিত হয়।

উত্তর : তারার পরিবর্তন মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে ঘটছেনা। এটি তারার ভেতরে শক্তি তৈরির প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে হচ্ছে। ভেতরের নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদিত হবার সময় একটি জ্বালানি ফুরিয়ে আর একটি জ্বালানিতে যাবার সময় পরিবর্তন হয়। সব জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে আরো বড় পরিবর্তন আসে। তারার বস্তুগুলো নিজেই নিজের উপর ধসে পড়ে– অতি সংকোচিত হয়। এভাবে আরো নাটকীয় পরিবর্তন আসে।

প্রশ্ন ৫: মহাবিশ্বে বস্তুর কণিকাগুলো কেমন করে সৃষ্টি হয়েছিল? যেমন ইলেকট্রনের সৃষ্টি কেমন করে হলো?

উত্তর : শক্তি থেকেই জোড়কণা তৈরি হবার মাধ্যমে বস্তু কণিকা সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্বের জন্মের পর পর। যেমন আলোক কণিকা ফোটন থেকে জোড়কণা সৃষ্টি হয়েছিল একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন। ইলেকট্রন একটি কণিকা পজিট্রন তার প্রতিকণিকা। উভয়ে মিলে আবার দুটিই বিলীন হবার কথা। কিন্তু প্রতিসাম্যের অভাবের কারণে শেষ অবধি কণিকাগুলো প্রতিকণিকার চেয়ে কিছু বেশি উৎপাদিত হয়েছিল। তাই সব ইলেকট্রন পজিট্রন বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও কিছু বাড়তি ইলেকট্রন থেকে গেছে।

প্রশ্ন ৬: মহাবিশ্বের ইতিহাস আপনি বিগ্‌ব্যাং এর কয়েক মিলিসেকেন্ড পর থেকে শুরু করলেন কেন? এর আগের ক্ষুদ্র সময়টি বাদ দেবার কারণ কী ?

উত্তর : বিগ্‌ব্যাং এর কয়েক মিলিসেকেন্ড পর থেকে ঘটনাগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত। এদের সম্পর্কে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত তত্ত্বের ভিত্তিতেই আমরা অনেক কিছু জানি। কিন্তু ঠিক বিগ্ ব্যাং এর মুহূর্তগুলোর পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের তত ভাল জানা নাই। নানা তত্ত্ব রয়েছে কিন্তু সেগুলো পরীক্ষণে প্রমাণিত নয়, এবং অপেক্ষাকৃত জটিলতর। তাই এগুলো আলোচনায় শেষের দিকে এনেছি।

প্রশ্ন ৭: দূর থেকে আলোর বর্ণালী দেখে সেখানে কোন পরমাণু রয়েছে তা কী ভাবে বুঝা সম্ভব?

উত্তর : এটি সম্ভব কারণ ঐ আলো আসছে পরমাণুগুলো থেকেই এবং আলোর বর্ণালী হচ্ছে পরমাণু একরকম পরিচয় চিহ্নের মত, যেমন আঙ্গুলের ছাপ একজন মানুষের পরিচয় চিহ্ন হতে পারে। প্রত্যেক পরমাণুর বিভিন্ন শক্তি স্তর আছে যার উপরের একটি থেকে নিচের একটিতে যাবার সময় আলো নির্গত হয়। ঐ আলোর বর্ণালী রেখা অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ ঐ দুটি স্তরের শক্তি পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। কাজেই ঐ বর্ণালী রেখা ঐ পরমাণুর পরিচয় বহন করে। যেমন সোডিয়াম থেকে নির্গত আলো যেখান থেকেই আসুক না কেন সেখানে বর্ণালীর বিশেষ জায়গায় খুব কাছাকাছি দুটি হলুদ লাইন থাকবে। এটি লবণ ছিটা দেয়া আগুনের শিখা থেকে আসলেও হবে, অথবা রাস্তার সোডিয়াম বাতি থেকে আসলেও হবে। ওটি দেখেই আমরা বুঝতে পারবো ওখানে সোডিয়াম আছে।

প্রশ্ন ৮: আপনি বল্লেন পাঁচ বিলিয়ন বছর পর সূর্যের আয়ু ফুরিয়ে যাবে। তখন আমাদের কী হবে?

উত্তর : পাঁচ বিলিয়ন বছর অনেক দীর্ঘ সময়। তখন প্রজাতি হিসাবে মানুষ থাকবে কিনা তাও অনিশ্চিত। তাছাড়া আশা করা যায় তার বহু আগেই মানুষ অন্য কোন তরুণতর তারার উপযুক্ত গ্রহ উপগ্রহে চলে যেতে পারবে।

প্রশ্ন ৯: সুপারনোভার বিস্ফোরণের সময় লোহা থেকে আরো বহু ভারী ধাতু সৃষ্টি হয়েছে। তখন থেকে সূর্য এই সব ধাতু পেয়েছে। সূর্য থেকে পেয়েছে পৃথিবী, এবং পেয়েছি আমরা। এমনকি হতে পারেনা মহাবিশ্বের কোথাও এমন সব মৌল রয়েছে যা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

উত্তর : আমরা যে সব মৌল সূর্য বা মহাবিশ্ব থেকে আবিষ্কার করেছি তা নয়। জানা মৌল হতে তার সূত্র ধরে আমরা সম্ভাব্য সব মৌলই পেয়ে গেছি। স্থায়ীগুলো তো পেয়েছিই অস্থায়ীগুলোও পেয়েছি। এগুলোই মহাশূন্যেও দেখা যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ আমাদের পরিচিত জগত প্রোটন নিউট্রন-ইলেকট্রনে গড়া যে ধরনের পরমাণু দিয়ে তৈরি সে রকম নয় এমন অজানা অন্য ধরনের অদৃশ্য বস্তুর উপস্থিতির প্রমাণ মহাশূন্যে পাওয়া যাচ্ছে – যেগুলো পৃথিবীতে আমাদের কাছে নাই।

প্রশ্ন ১০: কোন কিছু নয় থেকে কোন কিছু– এভাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারটি কার্যকারণের সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করছেনা কী?

উত্তর : হ্যাঁ আপাত দৃষ্টিতে তা মনে হতে পারে। কিন্তু বিগ্ ব্যাং এর সময়ের যে কোয়ান্টাম বাস্তবতা তা কার্যকারণের ভিন্নতর ব্যাখ্যা দেয়, আমাদের সাধারণ জ্ঞানের থেকে যা ভিন্ন। তবে এগুলোও পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাজ করে। এ সম্পর্কিত তত্ত্বের খুঁটি-নাটিগুলো অবশ্য এখনো পরীক্ষিত না হলেও এর কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক ভিত্তি খুবই সুদৃঢ়।

প্রশ্ন ১১: আপনি WIMP নামের যে নূতন বস্তুর কথা বল্লেন তা দৃশ্যমান হবে কখন? এটা এখন দৃশ্যমান না হবার কারণ কী?

উত্তর : মহাবিশ্বে অদৃশ্য বস্তুর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়ার পর এর স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য কয়েক রকম তত্ত্ব দেয়া হয়েছে যেগুলো বেশ যুক্তিগ্রাহ্য। এরই একটি হলো WIMP এর তত্ত্ব। অদৃশ্য বস্তুর বিভিন্ন আচরণের ভিত্তিতে WIMP কণিকার গুণাগুণের ভবিষ্যৎদ্বাণী করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী এটি ভারী হলেও অন্য বস্তুর সঙ্গে খুবই দুর্বলভাবে বিক্রিয়া করে। সেজন্যই এর নাম হয়েছে WIMP Weakly Interacting Massive Particle এর আদ্যাক্ষরগুলো নিয়ে– অর্থাৎ দুর্বলভাবে বিক্রিয়াকারী ভারী কণিকা। এই দুর্বল বিক্রিয়ার কারণে একে বিশেষ সংবেদনশীল যন্ত্রে উদ্ঘাটন করতে হবে। তবে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন অনেকগুলোর মধ্যে অন্তত দু'একটি WIMP কণিকা উদ্ঘাটন যন্ত্রে ধরা পড়বে শিগ্‌গির। এজন্য তাঁরা ভূগর্ভের গভীরে যন্ত্র পেতে রেখেছেন। অন্য কণিকা মাটি ভেদ করে সেখানে পৌঁছতে পারবেনা, অথচ WIMP পারবে দুর্বল বিক্রিয়ার কারণে। এটিই গভীরে যন্ত্র পাতার উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ১২: আপনি বলেছেন প্ল্যাংকের সময়ের সীমা হচ্ছে $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড। এটি তাহলে নিম্ন সীমা। এর কি কোন উচ্চ সীমা আছে?

উত্তর : আসলে এটিই উচ্চ সীমা। এর চেয়ে ছোট সময়েই কোয়ান্টাম বাস্তবতাটির পুরো প্রকাশ ঘটবে। এর আর কোন সীমা নাই। কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার ফলে জাত ঘটনাগুলো এরকম অতি ক্ষুদ্র সময়, ক্ষুদ্র দূরত্ব, ইত্যাদিতেই স্পষ্ট হয়।

প্রশ্ন ১৩: মহাবিশ্ব এখন প্রসারিত হচ্ছে। এটি কি চিরকাল প্রসারিত হতেই থাকবে?

উত্তর: এটি জানা সম্ভব নয় এই কারণে যে নানা প্রমাণাদিতে দেখা যাচ্ছে মহাবিশ্ব বদ্ধ বা খোলা কোন অবস্থাতেই নাই, আছে এর দুয়ের ঠিক মাঝে সংকটে। এর অর্থ হলো শেষ অবধি মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকোচন শুরু হবে, নাকি প্রসারণ চলতেই থাকবে তা বুঝা যাবেনা। যদি ভবিষ্যতে উদ্ঘাটিত হয় মহাবিশ্ব সংকটের ঠিক কোন পাশে আছে বদ্ধ হবার দিকে, না খোলা হবার দিকে– তা হলেই বুঝতে পারবো মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কী।

প্রশ্ন ১৪: বিগ্‌ব্যাং এর মুহূর্তের ঠিক আগে কী ছিল এ সম্পর্কে সর্বশেষ চিত্রটি কী?

উত্তর: কোন প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব এ সম্পর্কে নাই– তবে বিভিন্ন প্রস্তাবিত তত্ত্ব আছে যার সব কটিই গাণিতিকভাবে যুক্তিগ্রাহ্য হলেও পরীক্ষণের কোন সুযোগ পায়নি। হকিংসের চার মাত্রার স্থান, কিংবা স্ট্রিং থিওরির বিগ্‌ব্যাং পূর্ব ব্রেন এমনি কিছু তত্ত্ব। কাজেই সর্বশেষ চিত্র দেয়া যাচ্ছেনা, বেশ কয়েকটি প্রতিযোগী চিত্র দেয়া যাচ্ছে।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে এবং দেশের তরুণ তরুণীদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করার ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এজন্য তিনি লেখালেখি, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার, বিজ্ঞান সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান বক্তৃতা ইত্যাদি সব মাধ্যম ব্যবহার করেছেন গত পাঁচ দশক ধরে। 'মহাশূন্যে মানুষ' এই পুস্তকমালাটিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেয়া তাঁর একটি বিজ্ঞান বক্তৃতামালার ভিত্তিতেই রচিত। ষাটের দশকে তিনি এদেশের প্রথম জনপ্রিয় বিজ্ঞান মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকীর' প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁরই সম্পাদনায় এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), নিজে কর্ণধার থেকে যাকে তিনি পল্লী-বাংলার সুবিধাবঞ্চিত তরুণ তরুণীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা ও হাতে কলমে জীবিকামুখি প্রযুক্তির বিস্তারে একটি সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন।

বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বিভিন্ন স্বীকৃতি প্রাপ্ত এই লেখকের লেখনী শুধু তাঁর নিজের বিষয় পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আধুনিক বিজ্ঞানে অতি ফলপ্রসূ বিভিন্ন শাখার অগ্রগতি নিয়ে তাঁর বুঝিয়ে বলার প্রচেষ্টা ও লেখার স্বচ্ছন্দ গতি রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক বই এবং প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক। বাংলাদেশে বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞান সাহিত্য, তরুণ তরুণীদের সক্রিয় বিজ্ঞান আন্দোলন কী ভাবে এগিয়েছে, তাঁর সম্পাদিত 'বিজ্ঞান সাময়িকীতে' এবং তাঁর রচনায় তার একটি ধারাবাহিক আলেখ্য পাওয়া যায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।